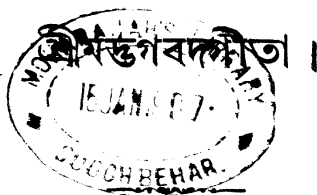


ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା ।

Printed by K. P. Chakravarti,
JAYANTI PRESS,
25, Pataldanga Street, Calcutta.



PUBLISHED BY
UMACHARAN BANERJEE,
5, Pratap Chandra Chatterjee's Lane, Calcutta.



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ।

Jayanti Press : Calcutta.

1902.

মূল্য ২৮ টাকা

272

সংগ্রহকারের নিবেদন ।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয় যে প্রণালীতে তাঁহার এই গীতাব্যাখ্যা প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেইরূপে ইহা সম্পূর্ণ হইলে, ধর্মজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের যে মহোপকার সাধিত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই, তিনি পুণ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকর্তার জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদিত “প্রচারে” এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটুকু তখন অনেকেই দেখিয়াছিলেন। যাহারা প্রচারে এই ব্যাখ্যা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, জানিতে চাহেন ; এবং সম্পূর্ণ হয় নাই শুনিয়াও, স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অনেক পাঠক ঐ অসম্পূর্ণ অংশটুকুই পাইবার অভিলাষ করেন। তাঁহাদের আগ্রহ-পরিতৃপ্তির জন্ত, প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।

ব্যাখ্যা দ্বারা গীতার উদার নীতি ও মহাত্মা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মূল গ্রন্থের যে সকল স্থান যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, অত্ৰ কাহারও সেই সকল স্থান ঠিক সেইরূপ বুঝা সম্ভবপর নয় ; সুতরাং তিনি যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্তু গীতার গ্রাম একখানি ধর্মগ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং রাখার প্রয়োজনও আছে।

এজ্ঞত অবশিষ্ট মূলও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অনুবাদ সহ ইহাতে নির্বেশিত হইল। বর্তমান গ্রন্থের লেখক মহোদয় কর্তৃক গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। তাহা হইলেও, উহাই এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত গীতার অনুবাদের যে অংশটুকু ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় সেটুকু আমাদিগকে এই পুস্তকে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন, এ নিমিত্ত আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহোদয়ের একান্ত স্নেহপাত্র “সাহিত্য”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই অনুমতি প্রাপ্তির বিষয়ে যত্ন করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহীত করিয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্বক এই পুস্তকের প্রফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন, এজ্ঞত ইহাদের নিকটও কৃতজ্ঞ আছি। ইতি।

কলিকাতা, } সংগ্রহকার,
২৪শে ভাদ্র, ১৩০৯। } শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অল্প ব্যাখ্যা অনাবশ্যক । তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত । এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন, যে সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক । কিন্তু গীতা এমনই ছন্নহ গ্রন্থ যে টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না । এইজন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয় ।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে । এক, শঙ্করাদি-
প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া
যাইতে পারে । দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা
যাইতে পারে । কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন ।
বাবু হিতলাল মিশ্র নিজ কৃত অনুবাদে, কখন শঙ্কর-
ভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন
করিয়াছেন । পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেশবনাথ
দত্ত নিজ কৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত
টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন । ইহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক
তজ্জ্ঞ বিশেষ ধ্বগী । প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন ;

বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা স্মৃতির বিষয় যে “গীতাসন্দীপনীতে” গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জ্ঞ কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকিতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগকেই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থ “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাহারা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের
বাণ্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে ম্লহজে বৃদ্ধিতে পারেন না।
ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষায় নৈসর্গিক ফল।
পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী
হইতে এত বিভিন্ন, যে ভাষার অনুবাদ হইলেই তাবের অনুবাদ
হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমরাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায়, শৈশব
হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়া
চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত
হইলে প্রাচীন ভাষা সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহা-
দিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়,
পাশ্চাত্য তাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান,
আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায়
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার
সম্ভাবনা, পূর্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই।
থাকিবারও সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারা যে সকল পাঠকের
সাহায্য জন্ত ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে
সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই
টীকায় যতদূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালার প্রচার
করিয়াছেন, বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি;
বথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ।
আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি।
আনন্দগিরি-টীকা-দ্বলিত শাক্তরত্নাবলী, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা,

রামানুজভাষা, মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্ত মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্ত একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটয়াছে।

কলিকাতা।

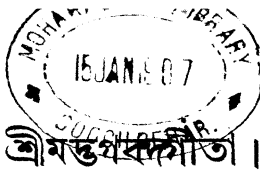
১২৯৩ সাল।

}

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র ।

প্রথম অধ্যায়	অর্জুনবিষাদ	...	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	সাংখ্যযোগ	...	...	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	কর্মযোগ	...	...	১৭০
চতুর্থ অধ্যায়	জ্ঞানবিভাগযোগ	...	...	২২১
পঞ্চম অধ্যায়	কর্মসন্ন্যাসযোগ	...	...	২৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়	অভ্যাসযোগ	...	...	২৫৮
সপ্তম অধ্যায়	জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ	...	...	২৬৯
অষ্টম অধ্যায়	ব্রহ্মযোগ	...	...	২৭৭
নবম অধ্যায়	রাজবিচারাজগুহযোগ	...	...	২৮৫
দশম অধ্যায়	বিভূতিযোগ	...	...	২৯৪
একাদশ অধ্যায়	বিশ্বরূপদর্শন	...	...	৩০৪
দ্বাদশ অধ্যায়	ভক্তিযোগ	...	...	৩২২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগ	...	...	৩২৭
চতুর্দশ অধ্যায়	গুণত্রয়বিভাগযোগ	...	...	৩৩৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	পুরুষোত্তমযোগ	...	...	৩৪৩
ষোড়শ অধ্যায়	দৈবামুরসম্পদ্বিভাগযোগ	...	...	৩৪৯
সপ্তদশ অধ্যায়	শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	...	...	৩৫৫
অষ্টাদশ অধ্যায়	মোক্ষযোগ	...	...	৩৬১
গীতামাহাত্ম্য	...	...	...	৩৭৯



প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্বের ৩য় অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতা পর্বোধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্বে যাহা ঘটয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দ্রুপদ্যোন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যুতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপট দ্যুতে পরাজিত হইয়া এই পণে

আবদ্ধ হয়েন, যে দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর ত্র্যযোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তারপর, পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু ত্র্যযোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয়পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা-নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মানুক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয় তাহা জানিবার জন্ত বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুরোধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে “আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিশাপ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বরপ্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর

দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত সকলই সম্ভবোক্তি। এক্ষেত্রে, উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্রুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোকৃত ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্ত দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটা চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেখর বা থানেখর নগরের দক্ষিণবর্তী। আখালা নগর হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়া ভয়সা করি কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই জন্ত উহাকে সমস্তপঞ্চক বলা বাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন । তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে । তিনি দুর্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্বপুরুষ ; এজন্য দুর্যোধনাদিকে কোরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাণ্ডবদিগকেও বলা হয় । তিনি এই স্থানে তপস্তা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত হইয়াছে, যে তাঁহার তপস্তার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ । ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদ্রগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মথোবিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অত্রে-বাম্বিত্যাম্ । তেবাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস । তস্মাদাহঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্ ।” অর্থাৎ দেবতারা এই খানে যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন, এজন্য ইহাকে ‘দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান’ বলে ।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্কাদ্বিতীয়ে কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপর্কে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—“উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী ।” (৮৩ অধ্যায়) মহা-সংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্বদন্তরং ।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে । ২ । ১৭ ।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত একই । কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে ।

ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ

ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রঘনপিপ্তনং কোরবং তন্তুজ্ঞেথাঃ ।

রাজস্থানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্তমিব কমলান্ভ্যাবর্ষনমুখানি ॥

মেঘদূত ৪৯ ।

কিন্তু মনুতে আবার অত্বপ্রকার আছে । যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।

এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়সাঙও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে “ধর্মক্ষেত্র” বলিয়াছেন । *

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত ; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন । কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে । তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ । যে স্থানে অভিমুখ্য সপ্তরথিকর্তৃক অস্ত্রায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে ‘অভিমুখ্যক্ষেত্র’ বা ‘অমিন’ বলিয়া থাকে । সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করেন । যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল ; এখনও তাহাকে ‘অস্থিপুর’ বলে । যেখানে সাত্যকিতেও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অস্ত্রায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে । জনপ্রবাদ আছে যে ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায় ।

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, “*Le champ du bonheur*,” অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র ।

সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একথণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল । তাহাই কহীন্মুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে । কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই ।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেয়ই মুখে আছে । একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে “কুরুক্ষেত্র বহুইতেছে ।” অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না । বিশেষ টমসন্, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন । তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল । *

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুতং দুর্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদক টমসনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি । কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

“A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often identified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra.”

এই টুকুর ভিতর ৫টা ভুল । (১) ধর্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই । (২) কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে । (৩) “The flat plain around Dehli কুরুক্ষেত্র নহে । (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে । (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে । এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না ।

সঞ্জয় বলিলেন—

বাহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দ্রুপদ্যোধান আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন । ২ ।

দ্রুপদ্যোধানাদির অশ্ববিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র জ্ঞোণ । ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু । ইনি ব্রাহ্মণ । কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় । শাস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে । জ্ঞোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, ইহার। সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ দচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে ।

যুদ্ধার্থ সৈন্য সন্নিবেশকে বাহ বলে ।

সমগ্রস্ত তু সৈন্যস্ত বিতাসঃ স্থানভেদতঃ ।

স বাহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যহরচনাই প্রধান কার্য্য ।

পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুন্ম ।

ব্যুত্যাং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেন ধীমতা ॥ ৩ ॥

হে আচার্য্য ! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা বাহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন । ৩ ।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি । তিনিই বাহ রচনা করিয়াছিলেন । কথিত আছে ইহার পিতা জ্ঞোণবধ-কামনার বজ্র করিলে ইহার জন্ম হয় । ইনিও জ্ঞোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন । এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে

স্মরণ করিতে হইবে । নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শি-
দিয়াছিলেন । আচার্য্যের ধর্ম বিদ্যা দান ।

অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঞ্জবঃ ॥ ৫ ॥

নুদামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজা চ বীর্য্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথঃ ॥ ৬ ॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জুন তুল্য,
যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান,
বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য,
বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমোজা, স্তম্ভদ্রাপুত্র, (৫)
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ । ৪, ৫, ৬ ।

(১) যুযুধান—যজ্ঞবংশীয় মহাবীর সাত্যকি । (২) দ্রুপদ,
বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিনীপতি ।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চedi দেশের অধিপতি বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছেন । অস্ত্রবিধ বর্ণনাও আছে । (মহা, উদ্যোগ,
১৭১ অধ্যায়) ।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম । বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের
পিতা শুরের পিতৃঘন্থ-পুত্র । পাণ্ডবমাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে
প্রতিপালিতা হইলেন । পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল ।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু ।

অস্মাকম্বু বিশিষ্ট। যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ! ।

নায়ক। মম সৈন্ত্যন্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! আমাদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, আমার সৈন্তের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্ত সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বখামা (৭), বিকর্ণ, সৌমদত্ত-পুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯) । ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কোরবদিগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণপুত্র ।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা ।

(৯) দ্রুপ্যোধনের ভগিনীপতি ।

অশ্বে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বৈব যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্ত ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন) । তাঁহারা সকলে নানাশস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ ॥ ৯ ॥

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্

সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্যাপ্তং তদস্ম্যাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্ত অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত শব্দের অর্থ ভীষ্মরস্বামীর টীকাহু-সারে করা গেল। অত্রে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্বএব হি ॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম হুর্ঘ্যোধনের সেনাপতি।

তস্ম সঞ্জয়নয়নং হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) হুর্ঘ্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্খ-ধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম হুর্ঘ্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যহন্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন, শঙ্খ, ভৈরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র
সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল । ১৩ ।

ততঃ শ্বেতৈর্হ যৈষুক্তে মহতি শ্রুদ্দনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪ ॥

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জুন দিব্য শঙ্খ
বাজাইলেন । ১৪ ।

পাঞ্চজন্মং হ্রবীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দ্রুম্যো মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্নগোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম
ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন । কুন্তীপুত্র রাজ
যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল স্নগোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্প
(নামে) শঙ্খ বাজাইলেন । ১৫ । ১৬ ।

কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌতন্ত্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধর্ম্মীর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট
অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সূত

পুত্র,—হে পৃথিবীপতে !—ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক শব্দ
সেই বাজাইলেন । ১৭ । ১৮ ।

ইহ

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদায়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যানুদয়ন্ ॥ ১৯ ॥ *

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ
এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল । ১৯ ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্ৱ ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

পরে হে মহীমতে ! + ধার্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া
। অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া
! হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন । ২০ ।

“ব্যবস্থিত” শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন
“যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত ।”

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

যোৎসামানানবেক্ষেহহং যএতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্বুদ্ধৈরুদ্ধৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

* তুমুলোহভ্যানুদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে ।

+ বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে । সঞ্জর
বুদ্ধক্লেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন ।

অৰ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনার অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুৰ্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর । ২১।২২।২৩ ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্চৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত* ! অৰ্জুন কর্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর । ২৪।২৫ ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥

শুশ্রূরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োৱপি ॥ ২৬ ॥

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অৰ্জুন উভয়কেই “ভারত” বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহারা দুঃশলপুত্র ভরতের বংশ ।

শ্রীমন্তগবদগীতা ।

তখন অৰ্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহ-
গণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, স্বশুরগণ,
সখিগণ * এবং স্বহৃদগণকে দেখিলেন । ২৬ ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমত্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া,
পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূৰ্ব্বক এই কথা বলিলেন । ২৭ ।

অৰ্জুন উবাচ

দৃষ্টৌ মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।†

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অৰ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ ! এই যুদ্ধে সন্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া
আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুক হইতেছে । ২৮ ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং অসংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে
গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে । ২৯ ।

ন চ শক্রোন্ম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

* সখা ও স্বহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে । যাহার নিকট উপকার পাওয়া
গিয়াছে সেই সখা ।

† দৃষ্টৌ মং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ । ইতি পাঠান্তর আছে ।

হে কেশব ! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি ছলক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হৃদা স্বজনমাহবে।

ন কাঙ্ক্ষ্যে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ ! আমি জয় চাহি না, রাজ্য সুখ চাহি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।

যেষামর্থো কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ব্রতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্ত রাজ্য, ভোগ, সুখ, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা, এবং কুটুম্বগণ, যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি ? হে মধুসূদন ! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪।

“আমি হত হই হইব (ব্রতোহপি)” কথার তাৎপর্য্য এই যে “আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। অর্জুনের “মৃহযুদ্ধের” কথা আমরা অনেকবার
 শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজাস্য হেতোঃ কিম্মু মহীকূতে ।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ননঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্তই বা
 ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনর্দন ? ৩৫ ।

পাপমেবাত্মাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্মাহী বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ । *

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমরাদিগকে পাপ
 আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে
 বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া
 আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? ৩৬ ।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ ॥

যে ঘরে আগুণ দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী,
 ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয়জন
 আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা
 অর্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন, যে যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে
 আততায়ী বধ্য তথাপি ধর্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য।

* সবান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে ।

ধর্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র ছর্ব্বল, সূতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা “Law” এবং “Morality”র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। “Law”র উপর “Morals”। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন এমনও বুঝাইতে পারে যে গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সূতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। “গুরুভাতৃস্বহৃৎপ্রভৃতীনিতান্ হৃদা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।”

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুং ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনর্দিন ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনর্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? । ৩৭।৩৮ ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎস্রমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯ ।

সনাতন কুলধর্ম—অর্থাৎ পূর্বপুরুষগরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম ।

অধর্ম্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রভুযান্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টাশ্চ বাঞ্চে'য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ ! অধর্ম্মাভিভবৈ কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বাঞ্চে'য় ! * বর্ণসঙ্কর জন্মায় । ৪০ ।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলশ্চ চ ।

পতন্তি পিতরো হেযাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয় । পিণ্ডোদকক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয় । ৪১ ।

দোষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

এইরূপ কুলদ্বদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায় । ৪২ ।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৩ ॥

হে জনাৰ্দ্দন ! আমরা শুনিয়াছি যে যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয় । ৪৩ ।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটা শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্যা পাঠকদিগের কাণে ভাল লাগিবে না । ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী

* কৃষ্ণ বৃকিংশসম্বৃত, এজন্য বাঞ্চে'য় ।

প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর “লুপ্তপিণ্ডো-
দকক্রিয়াঃ” প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতা-
কারের বিশেষ বিদেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও
বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিস্মিণী
ভগবত্বক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব তখন তত্বক্তির তাৎপর্য
বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই
যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী
হয় ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে
তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে।
বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়।
বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায়
যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না,
তাঁহারাও বোধ করি এতটুকু স্বীকার করিবেন। * বাকীটুকু

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(Thomson's Translation of the Bhagavadgita P. 7).

* By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not

কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার । † কথাটা অতি মোটা কথা বটে । কথাটা অর্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে— অর্জুনের এই “কুলধর্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ “স্বধর্মের” কথাটা তুলিবেন । এটুকু গ্রহণকারের কৌশল । “ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ঃ কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুধানি চ” এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে ।

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং ।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হায় ! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪৪ ।

allowed to perform them ; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu x. 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that “omnia divina humanaque turbare, ut qui natus sit, ignoret, ejus sanguinis, quorum sacrorum sit”

(Davies' Translation of the Bhagavadgita p. 26).

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them.

(Thomson p. 7).

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

যদি আমি প্রতীকারপরাস্থ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে
অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে । ৪৫ ।

সঞ্জয় উবাচ .

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাশিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জুন এইরূপ বলিয়া শৌকাকুল মানসে ধনুর্ধ্বাণ পরিত্যাগ
করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন । ৪৬ ।

ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জ্জুনসংবাদে অর্জুনবিবাদো *

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই
অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য । কাব্যের উপাদান সকল এখানে
বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে । কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত
হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে । পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা
ব্যবহা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন, পরম রণপণ্ডিত
আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন । একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে
বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন ।”

* কোন কোন পুস্তকে “সৈন্যদর্শন” ইতি পাঠ আছে ।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উত্তমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle) । তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যাভরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন । তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাণ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্ত্যাত্ম বাণের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল । সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জুন—বাঁহার উপরে কোরব-জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—“একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি কাহার সঙ্গে আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।” কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা বলিলেন, “এই দেখ ।” অর্জুন দেখিলেন দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্রালক, স্নহৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাঙীব খসিয়া পড়িল । বলিলেন, “কৃষ্ণ ! রাজ্য বাদের জন্ত, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল ?—আমি যুদ্ধ করিব না ।” এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাণ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে হৈর্ষ্য তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্ত সাহিত্য-ভগতে দুর্লভ । “ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং স্থানি চ”—ঐদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে ?

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তন্তথা কৃপাবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেষ্কণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন ।

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত
(অৰ্জুন)-কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন । ১ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যাজুষ্টিমস্বর্গ্যমকীৰ্ত্তিকরমৰ্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ।

হে অৰ্জুন ! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং
অকীৰ্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ? ২ ।

মা ক্লেব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্রয়্যুপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং তন্ত্বেদ্ব্যভিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয় ! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত
নহে । হে পরস্তপ ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌৰ্বল্য পরিত্যাগ করিয়া
উত্থান কর । ৩ ।

* “ক্লেব্যং মা ন গমঃ পার্ধ” ইতি আনন্দগিরি-বৃত পঠি ।

অর্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং স্বংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুন বলিলেন,

‘ হে শক্রনিহন মধুসূদন ! পূজার্হা যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব ? ৪ ।

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয় সেও শ্রেয় । আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায় তাহা রুধিরলিপ্ত । ৫ ।

ন চৈতদ্বিন্য কতরম্মো গরীযো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই, বা আমরাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত । ৬ ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি স্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছে যঃ শ্রামিশ্চিতং ব্রহ্মি তন্মে

শিষ্যন্তেহহং শাশ্বি মাং স্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও। ৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ ‘বাচস্পত্যে’ এই অর্থ নির্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। ‘দীন’ অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথাঃ—
“মহত্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ রূপণ উচ্যতে।” আনন্দগিরি বলেন “বোহিরাং স্বপ্নামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স রূপণঃ।” যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না সেই রূপণ।* শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে “এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব?” অর্জুনের ইতি বুঝিই কার্পণ্য। তিনি “কার্পণ্য-দোষ” ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ

* ভানীনাথ ত্রাঘক ভেলাং “কার্পণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন helplessness.”

বুঝিতে হইবে। অত্যা তীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন
নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুতাদ-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমুদ্ধম্
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য
পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে,
তাহা কিসে বাইবে, আমি দেখিতেছি না । ৮ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
ন যোৎসু ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তৃষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিতেছেন,

শত্রুজয়ী অর্জুন * হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব
না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন । ৯ ।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিবীদন্তুমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

* মূলে “গুড়াকেশ” শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জুনের একটা নাম।
তীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন ‘নিদ্রাজয়ী’। অস্ত্রবিধ অর্থও দেখা
গিয়াছে।

হে ভারত ! হৃষীকেশ হস্ত করিয়া উভয় সেনার মধ্যে
বিবাদপর অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যান্মশোচন্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গভাসূনগতাসূংশ্চ নান্মুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,

তুমি বিজ্ঞের স্থায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু যাহাদের জ্ঞান
শোক করা উচিত নহে তাহাদের জ্ঞান শোক করিতেছ। কি
জীবিত, কি মৃত, কাহারও জ্ঞান পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে
তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দ্রুপদ্যোদনাদি অস্থায় পূর্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ
করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।
এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য ?

মহাভারতের উত্তোগ পর্বে এই কথাটার অনেক বিচার
হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে যুদ্ধই কর্তব্য। তাই এই
উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী
হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের দিকান্তের যথার্থ
স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম আছে, তন্মধ্যে
সচরাচর যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিরুপকৃত। কিন্তু ধর্মযুদ্ধও আছে।
আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং
ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা

পরম ধর্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম । এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই ।* এ বিচারের স্থূল মর্ম এই যে, যেটা যাহার ধর্মাত্মক অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম । রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অত্যাচার পূর্বক, তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে ; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহৃত্তার দণ্ড বিধান করা কর্তব্য । যদি লোকে স্বৈচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণ পূর্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না । সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে । অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য । যদি বল ভিন্ন অস্ত্র সহপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয় । যদি বল ভিন্ন সহপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । এখানে বলই ধর্ম ।

মহাভারতে দেখি যে অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন । যখন, যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুজ্জি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবস্থূলভ লাস্তি ।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ বক্ত করিয়াছিলেন । পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার

* এবং দ্বন্দ্বীবন প্রথম খণ্ড দেখ ।

করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, স্তূতরাং এ স্থলে ধর্মের পথ কোন্টা তাহা অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন, যে যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসমনয়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সার মর্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিহচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্ত্যান্ত অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয়, যে যে কোশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে

১ হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা বাহিত
২ হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্ভূত, সেই সময়ে যে এক
৩ পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্তের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ
৪ অধ্যায় যোগধর্ম্য শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর
৫ বলিয়াও বোধ হয় না। একথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা
৬ যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা
৭ কর্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্য সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ
নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অত্ৰ ব্যক্তি ইহার
প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কুম্ভার্জুনের
কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে
শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন,
বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাস-
যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার
ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে
ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায়
না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের
মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন, যে এই গ্রন্থ মহাভারতাস্তর্গত, মহাভারত
মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্ক্সজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব
এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন
বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্ত এই ব্যাখ্যা
প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতার প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অন্যান্য সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা কি প্রকারে বলিব ? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্ত আগেই এই কয়টা কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি ?

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার মূল মর্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্তব্য।

আগে আমাদের বুঝিয়া দেখা চাই যে স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি ?

শঙ্করাদি পূর্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বৃথান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরণ বলিতেছিলেন, যে “ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল,” সেটা তাঁহার পরধর্ম্ম-বলম্বনের ইচ্ছা—কেননা ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

* শোকমোহাত্যাং হৃতিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্মৃতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে
সবৃত্তোহপি তস্মাদ্ভুক্তাঃপররাম পরধর্ম্মক ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্তুং প্রববৃত্তে।—
শঙ্করভাষ্য।

কিন্তু আমরা এই বাধ্যায় সকল বুঝিলাম কি ? বর্ণাশ্রম-ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম । কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম কি ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্কর্ণের বাহির ; তাহাদের স্বধর্ম নাই ? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম বিহিত করেন নাই ? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারত-বাসীর জন্য ধর্ম বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন ? ভগবদুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জন্যই ? স্নেহেরা কি তাঁহার সন্তান নহে ? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে ।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের* তুল্য । আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি “স্বধর্মের” অত্র তাৎপর্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই ।

বাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্ম । এখন মনুষ্যের ধর্ম কি ? বাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম । কি লইয়া মনুষ্যত্ব ? মানুষ্যের শরীর আছে, এবং মন† আছে । এই শরীরই বা কি ? এবং মনই বা কি ? শরীর কতকগুলি

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে বীণাখ্রীষ্ট না ভজে জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন ।

† “মন” চলিত কথা, এইজন্য “মন” শব্দ ব্যবহার করিলাম । এই চলিত কথাটা ইংরেজী “mind” শব্দের অনুবাদ মাত্র । হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে । তাহার পরিবর্তে “matter and mind” এই বিভাগের অনুবর্তী হওয়াই ভাল ।

জড়পদার্থের সমবার, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্য থাকে না ; কেন না মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এই গুলির নাম দিয়াছি—“শারীরিকী বৃত্তি”। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেই গুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তি গুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জ্ঞান। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে কল আর কিছু নাই। *

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল

* কোমং প্রভৃতি পাক্ষাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিন্তাপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “Thought, Feeling, Action,” ইহা সত্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্য পরিণামের কল জ্ঞান ও কর্ম এই দ্বিবিধ বলাও সত্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিতাবস্থা বলিতেছি।

জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন ।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে । এ জন্ত জ্ঞানার্জন বাহাদিগের স্বধর্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায় । ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মান্ শব্দ হইতে নিস্পন্ন হইয়াছে ।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তর্কর্ম আছে, ও বহির্কর্ম আছে । অন্তর্কর্ম কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ; বহির্কর্মই কর্মের বিষয় । সেই বহির্কর্মের মধ্যে কতকগুলিই হোক, অথবা সবই হোক, মনুষ্যের ভোগ্য । মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে । সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষিধর্মী ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্মী ; এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্মী । ইহাদিগের নামান্তর ব্যাংক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে । হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম । অতঃ তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম । এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম । কিন্তু অতঃ তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম । যখন জ্ঞানধর্মী, যুদ্ধধর্মী, বাণিজ্যধর্মী, বা কৃষিধর্মীর কর্মের এত বাহুল্য হয়, যে তদ্ব্যঙ্গগণ

আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা লোক শিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অল্প সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে একরূপ তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ভাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে*। এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া

* কেবল কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। “বাক্সালির উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, যে অনার্য্য জাতিবিশেষ-সকল হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র জাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুণ্ড্র কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্ততম কারণ।

কৃষিধর্মী । পঞ্চাঙ্গের পূর্বকালে আর্য্যসমাজের অধিকাংশ লোক
এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্মী ছিল । এবং
তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য ।

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্মী । সামাজিক
অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল, যে মনুষ্যমাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না । স্থূল
কথা, এই যে এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন
মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই । যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম । * এই
ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই
হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর
গ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার অন্তর্গত কর্ম্ম, তাঁহার Duty.
তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম । ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের
উদার ব্যাখ্যা । যাহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের
উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদ্বক্তাকে অতি
সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন । ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন ।

যাহা ভগবদ্বক্তা,—গীতাই হোক, Bibleই হোক, স্বয়ং
অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক, বা তাঁহার অনুগৃহীত
মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা
তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে । এবং তখনকার সমাজের
এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ,
তাহাই তৎকালে গৃহীত হয় । কিন্তু সমাজের অবস্থা, এবং
লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয় ।

* যথা চৌর্য্যাদি ।

তখন ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যায়ও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয় । কেন না, ধর্ম নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য । ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল একটী বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরানুপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না । কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় । কৃষ্ণোক্ত স্বধর্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্মও আছে ; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেননা উহা বর্ণাশ্রমধর্মের সম্প্রসারণ মাত্র । তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয় ; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয় ।

স্বধর্ম কি, তাহা যদি, যাহা হোক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম পালন কেন করিব তাহা বুঝিতে হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্বক এ তত্ত্ব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন । একটী জ্ঞানমার্গ, আর একটী কর্মমার্গ । এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞান-মার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্ম-মার্গ ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর । পর শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে ।

ন হেবাহং জাতু নাসং ন হং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে বে থাকিব না, এমন নহে। ১২। *

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জুন অহুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্বে শ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্ত শোক করিতে নাই, তাহার জন্ত তুমি শোক করিতেছ।” যে মরিবে, তাহার জন্ত শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না। দেখ আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্ত শোক করিবে কেন?”

ইহাই হিন্দুধর্মের মূল কথা—হিন্দুধর্মাস্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্মের নহে, খ্রীষ্টধর্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইসলামধর্মের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিশয়ে নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান ঐক্যে সকলের সম্মত। এই সকল ধর্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিশয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজ কাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম একদিকে, তাঁহারা আর একদিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রভাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জ্ঞান, বা না জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ত এই টাকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রত্যয়বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ”—অর্থাৎ “আমি” বলিলে বাহা বুঝিব, সেই * আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে বাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

“আমি হুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহু-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ আমি বড় হুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে Science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

একটী মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সূখ দুঃখ ভোগ বলিব ?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তৎকালে তাহার সূখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখ ভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমের মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সূখ দুঃখাদির ভোগকর্তা। যে সূখ দুঃখাদির ভোগকর্তা সেই আত্মা।” *

আদ্বৈতত্ব বিষয়ক, এই স্কুল কথাটা ত্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিপুল, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু-ধর্ম অগ্র সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটী অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর বহুসংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রান্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকলপাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যতদিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয় ততদিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্মের কথা। অন্ত কোন ধর্ম এই অত্যন্ত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পূর্বে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, “আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে

প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহাইহলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।” * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণ-ভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

“Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling,

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা সে বিলাতী Pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance.” *

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য এই যে আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাত্মক, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তত্ত্বিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

“In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do.”

পুনশ্চ—

“There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible ; and in like

* Three Essays on Religion, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ত এই কা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity ; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or inferrible as possible.... Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it ; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and, we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be

embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes ; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি ?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে প্রমাণ কি ? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটী দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে পুষ্পটী আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জনের শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের দ্বারা আমার প্রত্যক্ষের*

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের দ্বারা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

বিষয়। প্রত্যক্ষভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ন-
কৃত প্রত্যক্ষ হইতে, অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গর্জান
ধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই
আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ,
(২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অল্পবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন,
তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদিগণ অল্প
কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান
সম্বন্ধে ইহাও বলেন, যে যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে
অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই
তত্ত্বের মীমাংসা জ্ঞাত ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর
দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার
স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা কখন
কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরীরস্থ
আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন
প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে
প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই
নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অল্প কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন
প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই, যে তাহা হইতে
আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ
এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে ন্না।
অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। *

* তবে সর্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মৃত ব্যক্তির দেহবিষয়ক

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু ষথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি ধাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি ততদূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা ? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক

আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্মা এই রূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অবস্থা বিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিন্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এতদুপে ইউরোপ ও আমেরিকার Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব, এই প্রেত-তত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি এসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, যে প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলবোপে পড়িয়াছেন। ইহার নানাপ্রকার বার প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে প্রেতপ্রত্যক্ষের ষথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আনি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাহ্যনীর বিবেচনা করি না। ধর্ম বিজ্ঞান নহে ; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অহুসন্ধান করাই ভ্রম ।

“Our victorious Science fails to sound one fathom’s depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind*.* For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prison and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and delight †” যখন বিজ্ঞান একটা মূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, ‡ তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে ? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না । যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই ।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন, যে বিচার বড় অশ্রদ্ধ হইতেছে । যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞের কিছুই নাই ।

* আত্মা ।

† *Oriental Religions, India, P. 447.*

‡ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই ।

আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটা প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক-দিগের উত্তর, একটা আধুনিক জার্মানদিগের উত্তর। দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অল্পমান তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অল্পবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ামিকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাক। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাককে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটা পৃথক প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেকস্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রম জ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অল্পমান বিশেষ মাত্র। এক্ষণে “শাক” কি তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শাক, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া

উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে । পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন । হুল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্ত পুরুষ । যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শব্দরূপ প্রমাণ । খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ । কেন না প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না । যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অল্প প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই ; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ । তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না । আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন ?

তীহাদিগের জ্ঞান জন্মগত-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে । কান্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই । কিন্তু কান্ট এবং তাঁহার পরবর্তী কতকগুলি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক-দিগের মত এই যে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে । তাঁহারা বলেন কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ । তাঁহারা কেবল “বলেন”, ইহাই মত, কান্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয় স্থল । কান্ট ইহাও বলেন যে বাহ্যিক

আমরা বুদ্ধি বাল, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই “Transcendental Philosophy,” সর্ববাদী সম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতার বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুলভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জিত হইলে, আত্ম-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়। *

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর-ভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনিই পরমাত্মা, এবং স্বয়ংই সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জিত হয় নাই? উত্তর—না। সকলগুলি হয় নাই।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহীর যেমন এই দেহে কোমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য,
তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি । পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না ॥ ১৩ ॥

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা । এই
শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ ।
যেমন এই দেহেতেই আমরাগিকে ক্রমশঃ কোমার, যৌবন, জরা
ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তর-
প্রাপ্তি অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র । অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর
মাত্র, যেমন কোমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে
জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে ;—
যেমন কোমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না,
যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ
দেহ গেলে দেহান্তর-প্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব ?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে মরিলেই আবার জন্ম
আছে । আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ত্ব,
জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব । কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা
যেমন ত্রীষ্টিয়াদি অত্যাশ্চর্য প্রধান ধর্ম স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ
নহে । পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্মেরই আছে,
এমনও নহে । বৌদ্ধধর্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অত্যাশ্চর্য
ধর্মেরও ছিল বা আছে । তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং
ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । এজন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালি
এ মত গ্রাহ্য করেন না ।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই । পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না । তা না থাক, যাহার প্রমাণাত্মক তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে । এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি-সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না । তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই । যেমন জন্মান্তরবাদের আপোপদেশ ভিন্ন অস্ত্র প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অস্ত্র প্রমাণ নাই । বিশ্বাসের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাত্মকেও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসবান—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান নহেন ।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে । যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না । কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয় ।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয় ?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে ।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় । ইহা সচরাচর অসত্য জ্ঞান-দিগের বিশ্বাস ।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-দিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয়, বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন, যে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যা-দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন, যে যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন স্মৃকৃত করিয়াছে যে স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধের বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম, গৌতমোক্ত হিন্দুধর্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি অধিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই

সূত্রে গ্রথিত আছে । অতএব এই তত্ত্বটী আমাদিগকে বড় যত্ন-পূর্বক বুঝিতে হইবে । কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুর্লভ । আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, পুত্রবাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না । কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্ত ধর্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জিত হইয়া ইহার আলোচনা কালে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ! গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country :” টেলর সাহেব ইহাকে “one of the most remarkable developments of ethical speculation” বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন ।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক ।

বলা হইয়াছে, । জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি । পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে ? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন ? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে তাহা বুঝাইতেছি । ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে । একটা শক্তির নাম মায়া । এই মায়া কি তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব । এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন । তিনি চৈতন্যময় ; তাঁহা তিন্ন আর চৈতন্য নাই ; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি ইহা তাঁহারই অংশ ; তাঁহার সিসৃজ্যক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত

* Primitive Culture, Vol. I. p. 12.

হইয়া পৃথক ও দেহবদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই পৃথগ্ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়াবদ্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন ? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে ? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি ? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ একপন্থ নহে, যে জীবাত্মা চিরকালই, মায়াবদ্ধ থাকিবে । তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়াবদ্ধ অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন । সে উপায় কি, তদ্বিশয়ে মত ভেদ আছে । কেহ বলেন জানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায় ; কেহ বলেন কৰ্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে । এই সকল মতের মধ্যে কোনটী সত্য, বা কোনটী অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে । এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক । এখন, এই গুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কৰ্ম্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না । তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে ? আত্মা অবিনশ্বর ; সুতরাং দেহলষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে ।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে, যে দেহলষ্ট আত্মা কৰ্ম্মাঙ্ঘ্র-মায়ে সর্গে বা নরকে যাইবে । স্বৰ্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অন্তিমের প্রমাণাতাব । কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক । স্বীকার করা যাউক কৰ্ম্মফলাঙ্ঘ্রমায়ে আত্মা স্বৰ্গে বা নরকে যায় ।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ কালের জন্য যার, না অনন্তকালের জন্য যার ?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যার, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে ? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব কর্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্জন্ম জন্ম গ্রহণ করিবে, নয়, বল যে, অনন্ত কাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবানকে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সংকল্প কখন করে নাই বা কোন অসংকল্প কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে ? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যার, তবে জিজ্ঞাস্য করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন ? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাস্য করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন ?

যদি বল, তাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, তাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আশ্রয় করা হইল। কেন না তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমনত নহে । ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয় । বাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃতপাপের জন্ত অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে ? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামর-গণের মধ্যেও পাওয়া যায় না ।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্ত নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে ; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাশ হইল না । কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে । অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না । অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অনন্ত কালের জন্ত স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না । তুমি উর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌরুষার্থ্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে । তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটার উত্তর বাকি থাকে । সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে ? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না, কেন না, জ্ঞান কর্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাত্মক মুক্তি অপ্রাপ্য । কেন না স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম ক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ার অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের অভাব । অতএব

এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায় ?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,— জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্মের বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহ-ধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তার-তম্যানুসারে সন্দেহ যেনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাশ হয় নাই। সে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সুফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন ? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ, যে অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে ? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দ্রষ্টব্য,

তবে মানিব। গতাস্তরের প্রমাণাভাব, জন্মাস্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্রামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, যে তুমি যাদব কি মাধব। জন্মাস্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?”

কথা বড় শক্ত। জন্মাস্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মাস্তরের অকৃত দ্রুত ভিন্ন একরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে অকৃতের পুরস্কার ও দ্রুতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণ রূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার এক মাত্র পুত্র;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্মফল নহে, কেন না সত্ত্বপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম নাই। কাজেই তাহারা এখানে পূর্ব-জন্মকৃত কর্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন,—“সকলই কি কর্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে এমন কোন কর্ম বা অকর্ম নাই, যদ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে।

অতএব মৃত্যু কৰ্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কৰ্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কৰ্মফল বলিব কেন? হা! কৰ্মফল আর বাহা কৰ্মফল মহে সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতী-সংসর্গে অবস্থা বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটনাচ্ছে। এমন স্থলে জাতব্যক্তির কৰ্মফল খুঁজিব কেন?”

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি, যে এবিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে পূর্বজন্মকৃত ফলাফসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্যের গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সঙ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল, যে এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্য টুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে, যে, যে টুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্য টুকু,

বৈজ্ঞিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল । আমি ইহাও মানি, যে মাতা পিতা বা তৎপূর্বগামী পূর্বপুরুষগণের প্রকৃতি এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । কিন্তু মনুষ্য মধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজ্ঞিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না । দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে, তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় । ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে, যে গর্ভাধান কালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যতদিন শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ । না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজ্ঞেও একরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি ?”

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন । তিনি বলিতে পারেন, যে এই সকল তারতম্য এতদূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাবলী বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকি টুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্বজন্ম কল্লনা করা অনাবশ্যক । এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় নাই, যে এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায় ; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায় ।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা । যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না,

তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অত্যাশ্চর্য ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান।*

* "It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins, and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Primo, Herder, Sir Thomas

বলা বাহুল্য যে এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জিত জ্ঞান কৰ্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তত্পযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা Phædon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথাও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলা বাহুল্য। * আর যদি কোন সিদ্ধ

Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." *Oriental Religions ; India* p. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর প্রণীত "Primitive culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

পুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহার পূর্বজন্ম-স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না । কেননা দুইটী সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিশ্বাসি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না ?

৫। যোগীদিগের পূর্বজন্ম-স্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্বজন্ম-স্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয়, যে পূর্বে যেন কখনও এখানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্বে কখন ঘটয়াছিল । অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয়, যে এজন্যে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই । অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন, যে

“Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Menelaus slew at the siege of Troy. Afterwards he was Hermotunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cock to tell him of the siege of Troy—were things there really as Homer has said ? But the cock replies ;—“How should Homer have known, O Mikyllos, when the Trojan war was going on, he was a camel in Bactria.”—*Tylor's Primitive Culture, Vol II, p. 13.*

বলা বাহুল্য ইহা সব খোস গল্প মাত্র ।

পূর্ব্বক্ৰমে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটয়াছিল—
নহিলে একরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয় ?

একরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য । অনুসন্ধান
করিয়া জানিয়াছি সত্য । অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন, যে
তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল ।
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে । বৈজ্ঞা-
নিকেরা বলেন, যে এ সকল “Fallacies of Memory” অথবা
মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে একরূপ স্মৃতির উদয় হয়,
তাহা কার্পেণ্টার সাহেবের Mental Physiology নামক গ্রন্থ
হইতে দুইটি উদাহরণ উক্ত করিয়া বুঝাইব ।

“Several years ago the Rev. S. Hansard, now
Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty
for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while
there, he one day went over with a party of friends
to Pevensey Castle, which he did not remember to
have previously visited. As he approached the
gateway he became conscious of a very vivid impres-
sion of having seen it before and he “seemed to
himself to see” not only the gateway itself but
donkeys beneath the arch and people on the top of
it. His conviction that he *must* have visited the
castle on some former occasion—although he had
neither the slightest remembrance of such a visit,
nor any knowledge of having ever been in the
neighbourhood previously to his residence at Hurst-
monceaux—made him enquire from his mother if
she could throw any light on the matter. She at once

informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever.”

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটা উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests, to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her

ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew saying only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question ; the woman was a simple creature ; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু এই ত্রীলোকের "পূর্বজন্মান্বিতা বিচার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত ।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, যে একরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যতদিন না হয়, ততদিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা ভর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদ্ভূত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না যে মস্তিষ্কে পূর্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না এই সকল স্মৃতি যে পূর্বজন্মস্মৃতি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না পরমাত্মায় যাহা লীন তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক অস্তিত্ব

নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন, যে আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীব-জন্মে একটী নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। একরূপ কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেন না বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল সূত্র এই, যে জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটী নিয়ম এই যে জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,— নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র। * এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্বে হইতে বিद्यমান জড় পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অথ বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্ম গ্রহণ করিল, তাহা কিছুই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না আত্মা জড় পদার্থ নহে, সূতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সূতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ।

* নাবস্ত্যনাবস্ত-সিদ্ধি: *Ex nihilo nihil fit.*

অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধের হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন শুনা যাউক। *

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe. † The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be dispro-

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে Fourier, Soame Jenyns, Fignier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† Buddhism—p. 100.

ved, * for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

টেলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Buddhist Theory of "Karma," or "Action," which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." *Primitive Culture—Vol II. p. 12.*

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে । খৃষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না ; তাঁহারা বলেন স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন । টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যাকারণ সম্বন্ধে নিবন্ধ জীবদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে । কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত । জগতের শাসনপ্রণালী এই যে,

* যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে দেহভ্রষ্ট সমুদায় কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না । জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না, যে সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে । যদি এমন হয় যে কখন কখন দেহান্তর প্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না ।

কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্যস্ত হয় না। সেই গুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে তিনি বিচারকার্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না, অরং জগদীশ্বরকে কার্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটা ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য—অর্থাৎ miracle, কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ বোনি প্রাপ্ত হইবে। কন্ম কারণ, বোনিবিশেষ তাহার কার্য। এইরূপ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিবন্ধ কন্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—“miracle” প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোড়া খৃষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের একজন সর্কশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

“In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection;—the firm conviction and positive certainty

that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself.*

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মত বিজ্ঞ লেখক হ্রলভ ।

“The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural

* Philosophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition—p. 157-8.

and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth. *”

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মৰ্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাহারা, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটীতে ঈশ্বরোক্তির মৰ্ম্ম থাকে তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাঁহার বিচার্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ বাহা গীতায় আছে তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাসমাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয়, যে ইহা ভগবহুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হইলেন তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত মৰ্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

* Oriental Religions, India p 539.

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম সমস্ত মহুষ্যের জন্ত। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইঞ্জিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। একরূপ বিশ্ব-লৌকিক ও সদব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাহার যতটুকুতে আবদ্ধকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনাবদ্ধকারী। যাহার বাহ্যতে অবিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

নাশাংস্পর্শান্ত কোন্তের শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ ।

আগ্নাপারিনোহনিভ্যাংস্তাংস্তিতিক্ষদ ভারত ॥ ১৪ ॥

হে কোন্তের! ইঞ্জিয়গণ এবং ইঞ্জিয়ার বিষয়ে তৎসংযোগ, * ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর ॥ ১৪ ॥

একাদশ শ্লোকে বলা হইল, যে যাহার জন্ত শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্ত তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে একরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে; কেহই ত মরিবে না, কেননা আত্মা অবিনাশী। তুমি

* মাত্রাণ্ড স্পর্শাণ্ড ইতি শব্দরঃ ।

কাটিয়া পাড়িলেও সে থাকিবে, কেন না তাহার আত্মা থাকিবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন ক্রমান্তর জ্ঞানসমাজে গৃহীত । একাদশ শ্লোকে অর্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন । অর্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্ত শোক করিতেছি সে আর রহিল কৈ ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল । এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, যে এ রূপ ভেদ কল্পনা করা অল্পচিত, কেন না যেমন কৌমার যৌবন জরা একব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র । ইহাতেও অর্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা ছুঃখ কষ্ট আছেই ? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন ? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন ?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই ষট্শ্লোক শ্লোকে বলিতেছেন, যে, যে সকলকে তুমি এই ছুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত । যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে ততক্ষণ সেই ছুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে ছুঃখ থাকে না । যেমন যতক্ষণ স্বপ্নের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীত স্বরূপ যে ছুঃখ তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না । যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ করাই উচিত । যে ছুঃখ সহ করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্ত কষ্ট বিবেচনা করিব কেন ?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস-গুণে আর কোন ছঃখকেই ছঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতাক্ত সর্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম স্থখে আপ্লুত হয়। ছঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্ত, গোড়াতে এই ছঃখসহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও ছঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেননা তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও ছঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্ত “শীতোষ্ণ সুখদুঃখ” একত্র গণনা করা হইয়াছে। *

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে, ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উক্তার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়-গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, “মাত্রা আভির্দ্রায়ন্তে শব্দাদয় ইতি শোভাদিনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।” শ্রীধরস্বামীও ইরূপ বলেন যথা “মীযন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়প্ৰয়স্তানাং স্পর্শা বিষয়েঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।” মধুসূদন নরসিংহও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, “মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।” তাতেও বড় অসিদ্ধা ঘাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis অরণ করাইয়া দিয়াছেন যে এই মাত্রা শব্দ লাতিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি “মাত্রা-স্পর্শাঃ” পদের অনুবাদে “matter-contacts” লিখিয়াছেন। পরিমাণ-জ্ঞানের জন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের “তন্মাত্র” শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্তব্য। বলা বাহুল্য যে আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

যং হি ন ব্যাখ্যন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষবর্ত ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষবর্ত ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন ।

সুখ দুঃখ সহ করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন ? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ । সংসার দুঃখময় । যাহারা বলেন সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে । এ জন্ম জন্মান্তরও দুঃখ, কেননা পুনরীার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে । অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ । স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ । এই জন্ম সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন “ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ।” এখন, দুঃখ সহ করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল । কেননা, যে দুঃখ সহ করিতে শিখিয়াছে সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না । তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্ম মরিবার প্রয়োজন নাই । দুঃখ সহ করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহ জীবনেই মোক্ষলাভ হইল ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টৌহস্তত্ত্বনয়োস্তুত্বদর্শিতিঃ ॥ ১৬ ॥

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সৎবস্তুর অভাব হয় না । তত্ত্বদর্শি-গণ এইরূপ উভয়ের অস্ত্বদর্শন করিয়াছেন ।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে । যাহা থাকিলে তাহাই

সং ; যাহা নাই বা থাকিবে না তাহাই অসং । আত্মাই সং ; শীতোষ্ণাদি সূত্র দুঃখ অসং । নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সূত্র দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না । কেননা সং যে আত্মা, অসং শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্মবিরোধী । শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন । তিনি বলেন, “অসতোহনাত্মধর্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেবাত্মনি ন ভাবঃ ।” আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি ।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদবুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক আলোচনা করা কর্তব্য । তাহা হইতে আমাদের পূর্ব পুঙ্খেরা এই সকল বিষয় কোন দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন । এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় ছক্কহ । নিম্নে তাহার একটী অনুবাদ দেওয়া গেল ।

“কারণ হইতে উৎপন্ন অতএব অসংস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই । শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয় ; সুতরাং উহার সং পদার্থ হইতে পারে না । কারণ উহার বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে কখন থাকে না) । যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অথ কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায় । মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না ; সুতরাং ঘট অসং, উহার কারণ মৃত্তিকা সং ।

ভিন্ন অল্প কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ার সর্বপ্রকার বিকার-
পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি
কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্যের উপলব্ধি হয় না। সেই
সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া
উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এহলে আপত্তি
হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই
অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপ-
ত্তির খণ্ডন এই যে সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ;
সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের
ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার “আছে” বলিয়া বোধ
হইলে আর “নাই” বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর
যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই
বলিয়া বোধ হয় তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্ব সৎ ও
অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র, এই দুই প্রকার
জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য
পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়,
যেমন “নীলঃ উৎপলঃ” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন,
অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন ভাবে
নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্” “পটঃ সন্”
“হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত “সৎ” এই
জ্ঞান অভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং সৎ ও অসৎ জ্ঞান-
বুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু
লোকে এরূপ অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিবৃত্তের
(সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা প্রদর্শিত

হইয়াছে ; সং বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না । অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসং, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সং বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না ।

যদি বল ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তি-কারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক) । এই আপত্তি খাটিতে পারে না, কারণ তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না) । সে সংবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্য নাশে) বিনষ্ট হয় না ।

যদি বল সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অল্পসারে একটা ঘট বিনষ্ট হইলেও অল্প ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, “সুতরাং ঘটবুদ্ধি সং হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না ; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না ।

যদি বল সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না । একথা গুরুতর নহে । সংবুদ্ধি বিশেষণ ভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না । থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে ? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না । যদি বল ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সং হইবে, তাহার উত্তর এই যে মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে ‘সং ইদং উদকং’ এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সং অথবা অসং এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে) ।

অতএব দেহাদি বৃন্দ কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই। এবং সৎ যে আত্মা তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ সে সৎই, যে অসৎ সে অসৎই।*"

শঙ্করাচার্য্য যেমত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই, দুঃখ নষ্ট হইবে।

“—————The darkest day,

Wait till to-morrow, will have passed away.”

এখন, ১৪১৫-১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটা আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ-নিবারণ হইল; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখনিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া

* শঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাহাকে রোগের হুঃখ সহ করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে ?

না । তাহা নহে । হুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই । তবে যেখানে হুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম হয়, সেখানে হুঃখনিবারণ না করিয়া সহ করিবে । যে যুদ্ধে অর্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্মযুদ্ধ । ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম নাই । ধর্ম পরিত্যাগে অধর্ম । অতএব এস্থলে হুঃখ সহ না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম আছে । এজন্য এখানে সহ করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না ।

দ্বিতীয় আপত্তি । এই, হুঃখই সহ করিবে—সুখ সহ করা কিরূপ ? সুখ হুঃখ সমান জ্ঞান করিব ? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা, যে পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না ? তবে আর aceticism কাহাকে বলে ? সুখশূন্য ধর্ম লইয়া কি হইবে ?

ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি । ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ তাহা হুঃখের কারণ—তাহা হুঃখ মধ্যে গণ্য । ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্মাল্লসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য । আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে । তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য নহে । তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে ।

রাগদেববিমুক্তৈস্ত্ব বিবরানিহ্নৈশ্চরন্ ।

আত্মবৈশ্যাবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২৬৪

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব ।

আমরা দেখিরাছি যে দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম স্তম্ভ সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিদ্যামাশিতা । ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় স্তম্ভ—জ্ঞানান্তরবাদ । এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় স্তম্ভ সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনানুধ্যায়িতা ও অনিত্যত্ব । সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পূর্বে বেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি ।

“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক ; শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই । বাহ্যিক মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল । আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ । অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখে পুরুষে বর্ত্তে কেন ? “অসঙ্কোহরুপুরুষঃ ।” পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গ-বিশিষ্ট নহে । (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্র ।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে । (ঐ ১৪ সূত্র ।) “ন বাহ্যন্তরয়োৰূপ-রজ্যোপরজ্জকভাবোহপি দেশব্যবধানাৎ শ্রমশ্চ-পাটলিপুত্রস্থ-য়োরিব ।” বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরজ্জক ভাব নাই ; কেন না তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধান-বিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রম নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান । তদুপ ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন ? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ । বাহ্যে আন্তরিকে দেশ ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমনত নহে । যেমন ফাটিক পাত্রে নিকট অথবা দূরত্ব ; রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হইবে বলিয়া, পুষ্প

এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে ; ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে ; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে । সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল । অতএব এই সংযোগের উচ্ছিন্নিই দুঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ । “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিন্নিঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭) * ”

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্ত্যস্ত ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমহতি ॥ ১৭ ॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে । এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না ।

“যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা । এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ । এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শব্দর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত ।

যাহা সর্বব্যাপী তাহার বিনাশ হইতে পারে না ; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্বব্যাপী সম্ভাও থাকিবে । যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্বব্যাপী সম্ভা সর্বব্যাপীই থাকিবে । অতএব তাহা অব্যয় । আকাশ সর্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না । আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয় । যিনি সর্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী

* শব্দক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ।

ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্মের স্থূল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ, এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, যে ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইঞ্জিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে ইঞ্জিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হইতেন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা

বাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে “নমস্তে
পুণ্ডরীকাক” বলিয়া স্তব করিতেছেন। অস্ত্র স্থলে স্পষ্টতঃ
সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মহে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ

কল্পরূপায় কল্লান্তে নমস্ত ভ্যং ত্রিমূর্তয়ে ।

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন
দিলেন। কিন্তু তথাপি, এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার;
তাঁহার নাম “অনন্ত,” তিনি “সর্বব্যাপী”। যিনি অনন্ত এবং
সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না।
এবং তিনি যে নিঃশূণ ও নিরাকার তাহা পুনঃপুনঃ কথিত
হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাস্মৈ

নামরূপং ন যন্তৈকো যোহস্তিত্বেনোপলভ্যতে ।

ইত্যাদি।

১১৯৭৯

পুনশ্চ, বিষ্ণু “অনাদিমধ্যান্তঃ” স্মরণে নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার,
ইহাই যে হিন্দুধর্মের মন্ত্র, ইহা নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্মের সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে
ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্কনার
পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্মের সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?।

ইহার উত্তর এই যে, অস্ত্রদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমা-
র্চনা সাকারের উপাসনা নয়। এবং যে হিন্দু প্রতিমার্কনা করে,
সে নিতান্ত অস্ত্র ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না, যে এই
প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের

প্রকৃত প্রীতিমা । যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড, ঈশ্বর নহে, বা ঈশ্বরের প্রীতিমা নহে, এবং সে জানে তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না ।

তবে সে এ মাটির তাঁলের পূজা করে কেন ? সে যাহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না । তিনি অদৃশ্য, অচিন্ত্য-নীর, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত । কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সর্বময়ি আদ্যা-শক্তি ! তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না ; তুমি সর্বত্রই আবিস্কৃত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবিস্কৃত হও । আমি তোমার ঘেরুপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবিস্কৃত হও, আমি তোমার উপাসনা করি । নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব তদ্বিষয়ে মনঃ-স্থির করিতে পারি না ।”

এই প্রীতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজ-দিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ । ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, বাইবেলে ইহার বিবেধ আছে । শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না ইংরেজের ইহার উপর রাগ । যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা “আমাদের” অবশ্য নিন্দনীয় । প্রীতিমা পূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রীতিমা পূজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচার্যের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ বলে যে এই প্রীতিমা পূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে ; সুতরাং আমরাও তাহাই

বিশ্বাস করিতে বাধ্য ; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমা পূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলেন যে ভারত-বর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে ; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অল্পমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অমুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্ধামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অমুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্ত-নীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয় যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্য হয়, তবে ভক্তিমুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য ; ভক্তি-শূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌছিতে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না ; আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে ; এবং

এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিশ্চয়োক্তনীয়।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথাও বিচার নিশ্চয়োক্তন বোধ হয়। কেন না এমন যদি কেহ থাকেন, যে তিনি আপনার সান্ত্তিচিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিশূন্য হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে, বিচার বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমি “সাকারের উপাসনা,” এবং “সাকারোপাসক” ভিন্ন “সাকারবাদ” বা “সাকারবাদী” শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাদ” অবশ্য পরিহার্য। জৈন সাকার নহেন, চৈব পূর্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে জৈন যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দু-ধর্মের অবতারবাদের কি হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। জৈন নিরাকার, কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে জৈনাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মংগলীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। জৈন সর্বশক্তিমান, সুতরাং ইচ্ছামুসারে তিনি

যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দেশ করা হয় ।

“যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, যে বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরবাদ বুদ্ধি একই । স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে ।

অস্তবস্তু ইমে দেহা নিত্যশ্চোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ্ যুদ্ধস্য ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নখর মলিয়া কথিত হইয়াছে । অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর । ১৮ ।

নিত্য, অর্থাৎ সৰ্ব্বদা একরূপে হিত । (শ্রীধর)

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন । প্রত্যক্ষাদির অতীত ।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—“নিত্য অর্থাৎ সৰ্ব্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাঁহার এই দেহ স্নেহদুঃখাদিধর্মক, ইহা তৎসদৃশীদিগের দ্বারা উক্ত ; যখন আত্মার বিনাশ নাই, স্নেহদুঃখাদি সন্ধান নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্নেহদুঃখ ত্যাগ করিও না ।”

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক । তিনি বলেন—“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না । যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবন্ধ হইয়া তুষ্টীভ্যাবে ল্যঙ্কেন,

ভগবান্ তাঁহার কর্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র।
অতএব ‘যুদ্ধ কর’ ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।”

অনেকের বিশ্বাস, যে এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের
জায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে
গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা,
বাজারের উপজ্ঞান-গ্রন্থ নহে যে একবার পড়িবা মাত্র উহার
সমস্ত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না
করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্ম-
পালনের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম বলিলে শিক্ত
সম্প্রদায় বৃত্তিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—
Duty—শুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এত-
দংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন
করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম এক প্রকার নহে—কাহারও
স্বধর্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম ক্ষমা। শিপাহির স্বধর্ম
শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা।
মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম আছে। কিন্তু
সকল প্রকার স্বধর্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার।
যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। এমন
অবস্থা ঘটে, যে এই নৃশংস কার্য অপরিহার্য ও অবশ্যসম্পাদ্য
হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দখল ও লুণ্ঠিত করিতে
আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই
অপরিহার্য ও অবশ্যসম্পাদ্য ও স্বধর্ম। অতএব গীতাকার
স্বধর্ম-পালন সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial
instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা

বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার বড় ভাব-বিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্ত বর্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূৰ্ব হইতে স্বতঃ সঙ্গ্রহে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্ত ইনি আবার জন্মিবেন না। সেইজন্ত ইনি, অজ, অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা একরূপ; শাস্ত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ “নায়ং হস্তি” এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্ত অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটা মন্ত। তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটা ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটা ২০শ

শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক । গীতার
শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চনং মন্ততে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্ততে । ২।১৯

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্ত্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে । ২।২০

গীতা ।

হস্তা চেম্মন্ততে হস্তং হতশ্চেম্মন্ততে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্ততে ॥ ২।১৯

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাস্ত্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ ২।১৮

কঠোপনিষদ্ ।

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে—
গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই । এ কথা লইয়া বোধ
করি বেশি বিচারের প্রয়োজন নাই । আমরা দেখিব, উপনিষদ্
হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রাচীন
ভাষ্যকারদিগের এই মত । শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—“শোক-
মোহাদি সংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ
পার্থশ্চ সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়” এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—
“হস্তা চেম্মন্ততে হস্তং ইত্যাদ্যাম্ভুচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য-
এনমিতি ।”

এক্কে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি ।

প্রথম, আত্মা যদি কৰ্ত্তা নহে, তবে কৰ্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া

দিতে হয় । শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য । কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন ।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত । প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অঙ্গগামী হয় । ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী । ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না । এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্ ও তংশিষাগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন । আমরাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত ।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত— আত্মাই কর্তা । ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায় । আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব । একটা উপনিষদ্ হইতে, আর একটা পুরাণ হইতে ।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ।

নাশ্রুৎ কিঞ্চন নিষৎ ।

স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি । ১

স ইমান্ লোকান্ সৃজত অশ্বো মরীচীর্শ্বরমিত্যাদি

ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, স্মৃতরাং আত্মাই কর্তা ।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি । উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যত্নগা—

কঃ কেন হত্নতে জঙ্ঘজঙ্ঘঃ কঃ কেন রক্ষাতে ।

হস্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হসং সাধু সমাচরন্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং যাতয়তি হস্তি কং ॥২১॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে ? কাহাকেই বা হনন করায় ? ৥২১॥

ভাবার্থ—যে জানে যে দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে, যে সে “আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম” বলিয়া ছঃখিত হয়। কেন না আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীর নাশেরই বা আমি কেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর, পরশ্লোকে কথিত হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

শ্রুত্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

যেমন মানুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র *

* “It was if my soul were thinking separately from the body ; she looked upon the body as a foreign

গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয় । ২২।

অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক্ বা না দিক্, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহ-নাশ নিবারণ হইবে না । তবে কেন যুদ্ধ করিবে না ?

অরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকাৰ্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোক-মোহপ্রযুক্ত ধর্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযুক্ত্য । নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহ-মাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে, যে কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই । খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—ব্যাক্তিতেও পারে না । এখানে বিবেচ্য ধর্মযুদ্ধে শোকনোহের কোন কারণ আছে কি না ? উত্তর—কারণ নাই, কেন না আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর । দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি ?

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাশকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

substances, as we look upon a garment." Wilhelm Meister, Carlyle's Translation. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে ।

এই (আত্মা) অঙ্গে কাটে না, আঙুলে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জগৎ অঙ্গাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্রেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সৰ্বগত, স্থানু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য, বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থানু, অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্বরূপ অপরিভ্রাণী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য—কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য, ইত্যাদি, একজগৎ আত্মা নিত্য; নিত্য একজগৎ সৰ্বগত, সৰ্বগত একজগৎ স্থিরস্বভাব, স্থিরস্বভাব একজগৎ অচল; অচল একজগৎ সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

* “নৈবং” পাঠান্তর।

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্বদাই জন্মে
সর্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্ত শোক
করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু
অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া। পরলোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু
পরলোকে, “ঋৎ জন্ম মৃত্যু চ” এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও
সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর, আত্মার বিনাশ স্বীকার
করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্ত
শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, যে আত্মাও
যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী
হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরলোকে বলা
হইতেছে।

জাতস্য হি ঋবো মৃত্যুঋৎ জন্ম মৃত্যু চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন স্বঃ শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭ ॥

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে, অতএব
যাহা অপরিহার্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ
করিয়াছে। “নিত্যং বা মনুসে মৃতম্” বলিয়া মানিয়া লইয়াও,
উত্তরে আবার বলিতেছেন, “ঋৎ জন্ম মৃত্যু চ।” যদি মরিলে
আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং বা
মনুসে মৃতম্” বলা আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ
করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ! ।

অব্যক্তনিধনাশ্চৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার)
নিধনে অব্যক্ত ; সেখানে শোকবিলাপ কি ? । ২৮ ।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে । শব্দের অর্থ করেন,
“অব্যক্তমদর্শনমহুপলক্ষিযেযাং ভূতানাং” অর্থাৎ যে (যে অব-
স্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলক্ষি নাই । শ্রীধর অর্থ করেন,
“অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্বরূপম্ ।” অর্থাৎ
ভূত সকল উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে । অপর
সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শব্দের অহুবর্তী হইয়াছেন ।
শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায় ।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল, আদিতে অর্থাৎ
জন্মের পূর্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল ; কেবল মধ্যে দিনকত
জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার
চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্ত শোক করিব
কেমন ? “প্রতিবৃক্ষন্ত স্বপ্নদৃষ্টবস্ত্ত্বিয শোকো ন যুক্ত্যতে”
(আনন্দগিরি)— যুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জায় জীবের জন্ত
শোক অহুচিত ।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্ঞ্যমান ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চাত্মঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শূণোতি

ঐহাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা) কে কেহ আশ্চর্য্যাবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যাবৎ বলেন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যাবৎ শুনিয়া থাকেন ; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না । ২৯ ।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই । আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্ত শোক করিয়া থাকেন বটে । কিন্তু তাহার কারণ এই, যে তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন । আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন । আত্মার দুর্জয়ের্তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি ।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে, যে “আত্মা অবিনাশী,” এবং “ইন্দ্রিয়াদির অবিসয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না । কিন্তু ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্কোষাতা প্রতিপাদন করা নহে । আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না । তদ্বিয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না । এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না । ইহাই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য ।

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্ত ভারত ! ।

তস্মাৎ সর্বগাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত ! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য । অতএব জীব সকলের জন্ত তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০ ।

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার ।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহঁসি ।

ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেদ্যোহন্যং ক্ষত্রিয়শ্চ ন বিদ্যতে ॥৩১॥

স্বধর্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না । ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই । ২১ ।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে । স্বধর্ম কি, তাহা পূর্বে বলিয়াছি । ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম—যুদ্ধ । কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম যুদ্ধ বলিয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এমন নহে । অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম । অনেক রাজা সর্বস্বাপহরণ জ্ঞানই যুদ্ধ করেন । তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্মানুমত নহে । কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয় । যোদ্ধৃগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্তী । তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধৃমাত্রেরই বাধ্য । কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন । এই অধর্ম যুদ্ধই অনেক । যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না । ভীষ্মের জ্ঞান পরমধার্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাস্তবশতঃ হৃষ্যোদনের পক্ষাবলম্বনপূর্বক অধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে । ইউরোপীয় সৈন্য মধ্যে খৃষ্টিানে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহৎ হৃর্ভাগ্য যে স্বধর্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্মে লিপ্ত হইতে হয় । ধার্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদুঃখ বিবেচনা করেন । কিন্তু ধর্মযুদ্ধও আছে । আশ্রয়ক্ষা, স্বজন-

রক্ষা, সমাজ রক্ষা, দেশ রক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্মরক্ষার জন্তও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম পালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান। অর্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম—অনর্থক স্বধর্মপরিত্যাগ। অর্জুন সেই অনর্থক স্বধর্মপরিত্যাগরূপ বোরতর অধর্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে কেহ মরিবে না—কেন না দেহী অমর। যাইবে কেবল শূত্রদেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্মে উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্ম্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

যুদ্ধ স্বর্গদ্বার স্বরূপ দ্বিদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অথ তেষু মিমং ধর্ম্যাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিঞ্চ হি হা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। ৩৩।

৩১ শ্লোকের চাকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকেব তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে ।

অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীৰ্ত্তি ঘোষণা করিবে । সমস্ত ব্যক্তির অকীৰ্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল । ৩৪ ।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্তস্তে ত্বং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । যাহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৩৫ ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে । তারপর অধিক দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬ ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বৰ্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বৰ্গ পাইবে । জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব, হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর । ৩৭ ।

৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭, এই চারিটী শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না । এই চারিটী শ্লোক দ্বিতীয় অধ্যোগ্য ।

গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই শ্লোকের বিষয় না ধর্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব ! ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধের কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জুনকে আশ্বত্থ সঙ্কল্পীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সঙ্কল্পীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যে লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম নহে। সত্য বটে আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই দুর্বল, যে অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই ধর্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর, চোঁর্যো ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোকনিন্দা ভয়ে চুরি করে না; অনেক পারদারিক লোকনিন্দা ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম হইল না; পিতলকে গিণ্টি করিলে দুই চারিদিন সোণা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোণা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাকরদিগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত— তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-

নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ লোক নির্দোষ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অব্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্যের ধৰ্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোকনিন্দা ভয়ে অনেকে যে ধৰ্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধৰ্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোক-নিন্দাভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অৰ্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদীষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন না গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্বাক্ত্তে স্নদীক্ষিত ; এক্রপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন, যে এই শ্লোক চারিটী প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে, যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে “লৌকিক ত্রায়” বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ত্রায়” পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায় ! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবী-ভোগের কথার পরেই “এষা-তেহতিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে” ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যঁাহারা এই চারিটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা

রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সংকর্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র ।

সুখদুঃখে সমে কৃতা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অতএব, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্বুদ্ধ হও । নচেৎ পাপযুক্ত হইবে । ৩৮ ।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেননা ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠের তাহা অবশ্য কর্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে । ইহাই গণ্ডাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা—

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে । ৪৮ ।

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে । এখন যথার্থ ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ ক্রমের বংশীরব । ৩৫-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কৃত প্রভেদ !

এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে হিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা পুন্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ ॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল । (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর । তদ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে ।

প্রথম—সাংখ্য কি ? “সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্ব-মনয়েতি সাংখ্য। সম্যগ্জ্ঞানং তস্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।” (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সাংখ্য। তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটী এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্তু ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্ত্বজ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি ? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, * এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, “কর্মযোগ” “ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গীতায় “যোগ” শব্দটী সর্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধন বিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটী উপায় বা সাধন, কর্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্ত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মযোগ। এই অর্থে “যোগ” “যোগী” “যুক্ত”

* যোগশিষ্টবৃত্তিনিরোধঃ।

ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে “যোগ” শব্দে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান ; এবং যোগ, কর্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে ; তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে ; Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্মযোগ ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ”। * জ্ঞানে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক † হইতে কর্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি তাহা অর্জুনকে বুঝাইয়া, “যদি অর্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া

* চতুর্থাধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। প্রভেদ কি পশ্চাৎ জানা যাইবে।

† মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না ?

থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিবারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই “কৰ্মযোগ” কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুৰুক্কোমুনৈর্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে। ৩৩

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অল্প প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যং সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোমৈগরপি গম্যতে
ইত্যাদি। ৫।৬।৫

এ সকল কথার মৰ্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কৰ্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল “কৰ্মবন্ধ” হইতে মোচন। কৰ্মবন্ধ কি? কৰ্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কৰ্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কৰ্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কৰ্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কৰ্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে ইহজন্মেই আমরা সকল কৰ্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের

প্রত্যাশা করিবার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই “বড়মানুষী,” করা যায় ; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালভ করা যায়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজ-দণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্মফলভোগ নাই, এমত নহে। এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং সাহায্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্য ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি, * পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যীহাদের ইচ্ছা হইবে সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি, যে সম্পূর্ণ ধর্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার

* ধর্মতত্ত্ব।

এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি । সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না । ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে । এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে, যে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায় । আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব । যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্মযোগ । ইহাও দেখিব । সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন । গীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্বে বলা গিয়াছে ।

উপসংহারে বলা কর্তব্য যে আর এক কর্মফলের কথা আছে । হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্মফল পাইবার জন্ত । এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না । একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অগ্ন্যাহুত যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে । তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে । ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপহিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিভতে ।

স্বল্পমপ্যস্তু ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

এই (কর্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই ; প্রত্যবায় নাই ;
এ ধর্মের অল্পতেই মহত্ত্ব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ।

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না । কেন না, অল্পজ্ঞানের

কোন ফলোপধায়িতা নাই ; বরং প্রত্যাবায় আছে, উদাহরণ—
সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে,
এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন ! ইহাতে (কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চ-
য়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে । কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি
বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে ।

শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত জ্ঞান
পাইব,” এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি । ইহা একই
হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে প্রাণিত হয় না । কিন্তু
যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি
নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহিমুখ, এবং সকাম, তাহাদের
কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্মফলগুণফলত্বাদির প্রকারভেদ
আছে, এজন্ত তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত
দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই । যাহারা কামনাপরবশ, এবং
কামনাপরবশ হইয়াই কাম্যকর্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারা-
ধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রাণিত হয় ।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই । ভগবান্ কর্মযোগের অবতারণা
করিতেছেন, কিন্তু অর্জুন সহসা মনে করিতে পারেন, যে কাম্য-
কর্মের অনুষ্ঠানই কর্মযোগ, কেন না তৎকালে বৈদিক কাম্য-
কর্মই কর্ম বলিয়া পরিচিত । কর্ম বলিলে সেই সকল কর্মই
বুঝায় । অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে কাম্য-

কৰ্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কৰ্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দন্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ ! অব্যবহিকগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকৰ্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত “(তত্ত্বিন) আর কিছুই নাই” যাহারা ইহা বলে, তাহার কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত ; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে ; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি। *

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ সংকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদকৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে, যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক ।

কাম্যকর্মের কথা হইতেছিল । এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে ; কেন না বলা হইয়া থাকে, যে এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি ।

সেই সকল কথা “জন্মকর্মফলপ্রদা ।” শব্দর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব কর্মণঃ ফলং জন্মকর্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্মফলপ্রদা ।” জন্মই কর্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্মফলপ্রদা ।” শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন ; “জন্ম চ তত্র কর্ম্মণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি ।” জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে । অনুবাদকেরা কেহ শব্দরের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্তী হইয়াছেন । দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

তার পর ঐ কাম্যকর্মবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈশ্বৰ্য্যের সাধন-ভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” বলা হইয়াছে । ইহা বুঝিবার কোন

“যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অহুরক্ত ; বহুবিধ ফল-প্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর ; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না ; যাহারা কামনাপরায়ণ ; স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বৰ্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে ; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বৰ্য্যে একান্ত সংসক্ত ; সেই বিবেকবিহীন মুঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয় শূন্য হয় না ।”

কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্তু ক্রিয়াবিশেষের বাহ্যল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। বাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “বেদ-বাদরত।” বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। বাহারা কাম্যকর্ম্মানু-রাগী তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা “কামাত্মা” বা কামনাপরবশ—“স্বর্গপর,” অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্তুই স্বর্গকামনা করে, কেন না স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তির অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিন্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে, এবস্থি বুদ্ধি নিশ্চয়াশ্রিত হয় না।

শ্রোত্রকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, স্মৃতরাং আপাততঃ শুনিতো সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। বাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্তু স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া

আর ধর্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না তাহাদের বুদ্ধি “বহশাখা” ও “অনন্তা” ইহা পূর্ব্বেশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ, এই উনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীন-কালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্য-প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয় হেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিদ্বাসী; ইহারা ঈশ্বরারাদনার অযোগ্য !

ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিককর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা কলে বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যন্ত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অমুবাদিনী, তদ্বক্ত্ত্ব জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতার উক্ত, সঙ্কলিত, ও সম্প্রসারিত হইয়া নিকাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিতে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অমুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য, যে যাহারা বলেন, যে বেদে যাহা আছে তাহাই ধর্ম্ম,

তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম নহে—যথা এই সকল জন্মকর্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন, যে যেমন একদিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা ধর্ম নহে, আবার অপরদিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম তত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদারণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্যস্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতধর্ম ইতি হ্যেবে বদন্তি বহবো জনাঃ ।

তত্ত্বে ন প্রত্যস্ম্যামি ন চ সর্কং বিধীয়তে ॥ ৫৬

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতং ॥ ৫৭ *

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক, এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যান্য বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা, যে এতদ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদ-নিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি,

* “অনেকে শ্রুতিকে ধর্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নির্মিত্ত অহুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কপি দেখিয় অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্তর্গত ১৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

তাহা মৎপ্রণীত “ধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের স্মরণ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। ‘হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্ত্র দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।’ বড় জোর বলিলেন ‘আমার পাপ ধ্বংস কর।’ দেবগণকে এইরূপ অতি-প্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম বলে।

কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধর্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দোরাণ্ডো ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রকৃতিভা-শালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্মাত্মক ধর্ম বুঝা ধর্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধান তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন।

তঁাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন । সেই বিপ্লবের ফলে
আসিয়া প্রদেশ অন্যান্যপি শাসিত । একদল চার্কাক—তঁাহারা
বলেন, কর্ম্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, মেচে বেড়াও ।
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন,
কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ । কর্ম্ম হইতে
পুনর্জন্ম । অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া
চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর । তৃতীয়
বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল । তঁাহারা প্রায়
ব্রহ্মবাদী । তঁাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত
চৈতন্যের অল্পসঙ্কানে তঁাহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জয়ের ।
সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পর-
মাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তঁাহার
বা আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে
পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা কঠিন—
তাহা জানাই ধর্ম্ম । অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স ।
বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞান-
বাদীদিগের কীর্ত্তি । ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সঙ্ক-
লের উদ্দেশ্য । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্ত্তিত
ও প্রচারিত হইয়াছে । কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও
সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক ।”

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে । কিন্তু অল্প জ্ঞানবাদী
যাহা দেখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন । তিনি
দেখিয়াছিলেন, যে জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে ; অন্ততঃ অনেকের
পক্ষে অতি দুঃসাধ্য । তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অল্প

পথও আছে ; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরি-
শেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং
অন্তমার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেগুণ্যো ভবাজ্জুন।

নিবন্ধে নিত্যসব্দের নির্বোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জুন ! বেদ সকল ত্রেগুণ্যবিষয় ; তুমি নিত্রেগুণ্য
হও। নিবন্ধ, নিত্যসব্দ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্
হও। ৪৫ ॥

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়ো-
জনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না।
প্রথম, “ত্রেগুণ্যবিষয়” কি ? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ ; ইহার
সমষ্টি ত্রেগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি ? সংসারে।
সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশ্যিতব্য (Subject)
তাহাই “ত্রেগুণ্যবিষয়।” সংসারই বেদের বিষয়, এইজন্ত বেদ
সকল “ত্রেগুণ্যবিষয়।”

শঙ্করাচার্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “ত্রেগুণ্য-
বিষয়াঃ ত্রেগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশ্যিতব্যো যেবাং-তে
বেদান্নিত্রেগুণ্যবিষয়াঃ।” ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায।
অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল
দিক্ বজায় রাখিবার জন্ত লিখিলেন “বেদশব্দেনাত্ৰ কৰ্ম্মকাণ্ডমেব
গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারজীব্যান বিবেকা-
বসরোহস্তুতীত্যর্থঃ।” অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থ কৰ্ম্মকাণ্ড
বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান

দ্বারা সংসারধোব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে না ।” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই ।

শ্রীধর স্বামী বলেন, “ত্রিগুণায়কাস্য সাকামা যো অধিকারিণস্ত-
দ্বিষয়াঃ কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকো বেদাঃ” । এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে “ত্রিগুণায়ক অর্থাৎ সাকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন ।” এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্কেটের অনুবাদ করিয়াছেন যে—“বেদসকল সাকাম ব্যক্তিদিগের কর্মফলপ্রতিপাদক ।” অত্যাশ্চর্য্য সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন ।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক । সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্কেট বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে “হে অর্জুন ! বেদ সকল সংসার-প্রতিপাদক বা কর্মফলপ্রতিপাদক । তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও ।” কথাটা কি হইতেছিল স্মরণ করিয়া দেখা যাউক । প্রথমে ভগবান্ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্মযোগ বুঝাইবেন অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু কর্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই । কেন না কর্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্তব্য । নহিলে প্রকৃত কর্ম কি, অর্জুন তাহা বুঝিবেন না । সে সাধারণ ভ্রম এই, যে বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-

প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কৰ্ম্ম । ভগবান্ বুঝাইতে চাহেন যে ইহা প্রকৃত কৰ্ম্ম নহে । বরং যাহারা ইহাতে চিন্তা-নিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনার তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না । এজন্য প্রকৃত কৰ্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কৰ্ম্ম নহে । এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে । ভগবান্ বলিতেছেন, যে বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে তাহাদিগেরই অন্তঃসরণীয় । তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না । ত্রৈগুণ্যের অতীত হও ।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্ধে তাহা কথিত হইতেছে । ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নিৰ্ঘন্দ হও, নিত্যসত্ত্ব হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও । এখন এই কটা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয় ।

১। নিৰ্ঘন্দ—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে ছন্দ বলে, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে । যে সে সকল তুল্য জ্ঞান করে সেই নিৰ্ঘন্দ ।

২। নিত্যসত্ত্ব—নিত্য স্বত্বগুণাশ্রিত ।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে । অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা তদ্রহিত হও ।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত । *

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম । কিন্তু যাহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাহারা বি্রূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি । পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন ।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥৪৬॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটা পূর্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

“শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টা যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয়। অরুক্ততী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থল তারা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ সমূহ নিগূর্ণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নিগূর্ণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরাপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন, তুমি সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিগূর্ণ-তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিঃসংশয় স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিগূর্ণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি বস্তুভাব হইতে বহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধান যোগ ও ক্ষেমাভ্যাসাদি পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিঃসংশয় লাভ কর।”

দ্বিতীয়। আর একটা নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্ত উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :—

১ম। সৰ্ব্বতঃ সংপ্রত্যুত্থানকে উদপানে যাবানর্থঃ, বিজ্ঞানতো ব্রাহ্মণশ্চ সৰ্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সৰ্ব্বতঃ সংপ্রত্যুত্থানকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূৰ্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সৰ্ব্বতঃ সংপ্রত্যুত্থানকে তাবানর্থঃ। এবং সৰ্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজ্ঞানতো ব্রাহ্মণশ্চ তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহাদের অনুবিধা হইতে পারে, এজন্ত প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলালমিশ্র-কৃত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“যাহা হইতে জলপান করা যায় তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্রত্যুত্থান শব্দবাচ্য

এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নিকীহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্বক্তৃবৃক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্বারাই সম্পন্ন হয় ।”

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন । শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি ।

“উদকং পীয়তে যস্মিন্ স্তুতদপানং বাপীকুপতড়াগাদি । তস্মিন্ স্বল্লোদকে একত্র কুংসার্থস্তাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্কোহপিঅর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্কেষু বেদেষু ততৎকর্মফলরূপোহর্থস্তাবান্ সর্কোহপি বিজ্ঞানতো ব্যবসায়াদ্বিকাবুক্তিবৃক্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত ভবত্যেব ।”

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলি পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেইরূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াদ্বিকা-বুক্তি-বৃক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ।”*

* শঙ্করাচার্য্য ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার । শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “সর্কেষু বেদেষু বেদোক্তেযু কর্মসু বোহর্থো যৎ কর্মফলং সোহর্থো ব্রাহ্মণস্ত সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজ্ঞানতো বোহর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকস্থানীয়াং তস্মিন্ স্তাবানেব সংপদ্যাতে ইত্যাদি । ইহার ভিতর অল্প যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব । সম্প্রতি “সর্কেষু বেদেষু” ইহার যেকোন অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠ্যকে মনোযোগ করিতে বলি । “সর্কেষু বেদেষু” অর্থ “বেদোক্তেযু কর্মসু ।” বে

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই।

‘যাবৎ,’ ‘তাবৎ’ শব্দ পরিমাণ বাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই, তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে, যে কেবল “যাবৎ” শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্তী “তাবৎ”-কে বুঝিয়া লইতে হয়; যথা—“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ “আমি যাবৎ না আসি (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।” অতএব স্পষ্টই হউক, আর উছই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটা তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে “আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতি কাল, উভয়ে সমান হইবে।” এখানে এই দুইটা সময় তুল্য বা তুলনীয়।

কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন “বেদশব্দেনাত্র কর্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে,” সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন “নর্কেষু বেবেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কর্মসু।”

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানেও বুদ্ধিতে হইবে যে দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে । যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুদ্ধিতে হইবে যে আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে । ইহার অন্তথা কদাচ হইতে পারে না ।

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে ; অতএব বুদ্ধিতে হইবে দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে অর্থাৎ, (১) উদপানে বা সন্ধীর্ণ জলাশয়ে অবস্থা বিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন (২) সমস্ত বেদে অবস্থা বিশেষে তাবৎ প্রয়োজন । কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে দুইটি যাবান্ এবং দুইটি তাবান্ । * অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে প্রথমে দুইটি বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটি বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে । প্রথম, সন্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে ; তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সন্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল । ইহাতে কোন অর্থবিপর্যয় ঘটিতেছে কি না ।

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর, যে কোন অর্থবিপর্যয় ঘটিতেছে না । কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে

* বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন ।

হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া ‘তাবৎ তুমি এখানে থাকিও’ বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন। যদি বলেন যে এই বাক্যের অর্থ ‘আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও’ তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।” (ক)

এই বাক্যটা উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর; এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

“তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।” (খ)

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে “তুমি যতদিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না। (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যতদিন আমি সুখী থাকিব ততদিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্ত শ্লোকের চারিটা চরণে ক্রমাশয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্। তাহা হইলে শ্লোকস্থ “যাবানের” গায়ে (ক) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) সৰ্কতঃ সংপ্লুতৌদকে

(গ) তাবান্ সৰ্কেষু বেদেষু

(ঘ) ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) তাবান্ সৰ্কতঃ সংপ্লুতৌদকে

(গ) যাবান্ সৰ্কেষু বেদেষু

(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না। *

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন মতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ্” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ;—

সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণশ্চ সৰ্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহানহোপাধায় প্রাচীন ঋষিতুলা ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার একরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, যে তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরবর্তী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য কি? সৰ্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সৰ্ব্বত্র জল-প্লাবিত—সকল ঠাইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সৰ্ব্বকলপ্রদ । প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন । কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । বৃহস্পতি বা শাক্য-সিংহ প্রভৃতি যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন । অতএব শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিস্প্রয়োজনীয় । কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে ব্রহ্মজ্ঞানেও বা বেদেও তা, একই ফল । তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল । শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ । এক্ষণে সেই “সৰ্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কৰ্ম্মসু” “বেদশব্দেনাত্র কৰ্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে ।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন । প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন ।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্ত মূল কোন প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেননি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায় । কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই । আর একটা ব্যাখ্যার জন্ত কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয় । কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক

এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত ? আমার কোন দিক্‌ই অনুরোধ নাই । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি সেইরূপ বুঝাইলাম । দুই দিক্‌ই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন । অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জ্ঞাত আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না । বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল । সে সম্বন্ধ কি, পূর্বে তাহা বলিয়াছি ।

তৃতীয় ; ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন । সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ একরূপ না বুঝিয়া তাঁহারা বুঝেন সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ “সংপ্লুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মাত্র । অতঃ ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে । তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

“To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water into which waters flow from all sides.”

ভ্রূংখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না । কিছু তাৎপর্য্য নাই । অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন । তিনি এই শ্লোকের একটা টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন—

“The meaning here is not easily apprehended.

I suggest the following explanation :—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits. Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy, &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ভ্রাম্য অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is well acquainted with them and knows how to wield them. We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use

of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail."

আমার ভ্রায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে “ব্রহ্মমপ্যস্ত ধর্মশ্চ” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাব্যকারদিগের যে সকল মহত্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্মার্থ বুঝিতে পারিবেন এমনত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন, বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি, যে ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জ্ঞান না যান। অশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি। এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জ্ঞানই এতট। ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে পুনাগাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব একদিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উর্দ্ধি-মালার মত তাঁহারও মানস সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের হৃদ্বোধ্য বেদোক্ত ধর্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া

পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে বৃদ্ধি আমার কর্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জ্ঞাত মন অভিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব! কোথায় আমায় কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। “ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর” এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে বাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই এক খানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবান্ অর্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এবা তেহ্‌তিহিতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন, যে এখন তোমাকে কৰ্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কৰ্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটু সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকৰ্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক দৈশ্বের একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন যে বেদসকল “ত্রেগুণাবিষয়” তুমি নিঃশ্রেণ্য হও, বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেননা, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত

হইলে বাপী কুপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না । 'কৰ্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কৰ্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া, ভগবান্ এক্ষণে কৰ্ম্মযোগ কহিতেছেন ;—

কৰ্ম্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্ম্মফলহেতুভূৰ্মা তে সঙ্গোহস্তকৰ্ম্মণি ॥ ৪৭

কৰ্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক । তুমি কৰ্ম্মফলহেতু হইও না ; অকৰ্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক । ৪৭

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কৰ্ম্ম” কি, “কৰ্ম্মফলহেতু” কি, “অকৰ্ম্ম” কি বুঝা চাই ।

“কৰ্ম্ম কি” কি, বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল । কৰ্ম্মফল তাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই “কৰ্ম্মফলহেতু” । কৰ্ম্মশূণ্যতাই, অকৰ্ম্ম । কৰ্ম্ম কি তাহা পরে বলিতেছি ।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কৰ্ম্ম করিও, কিন্তু, কৰ্ম্মফল কামনা করিও না । কৰ্ম্মফল প্রাপ্তিই যেন তোমার কৰ্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয় । কিন্তু কৰ্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্ত শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে । বলা হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কৰ্ম্মে বিরত হইও না । অর্থাৎ কৰ্ম্ম অবশ্য করিবে কিন্তু ফল কামনা করিয়া কৰ্ম্ম করিবে না ।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে । ইহাই জ্ঞানবিখ্যাত নিষ্কাম কৰ্ম্মতত্ত্ব । একরূপ উন্নত পবিত্র এবং মনুষ্যের

মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধি-বিন্দ্রংশ বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না, যে আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি, বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝাইতে পারিবেন। তবে যত টুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায়, বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম, কর্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার, বা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম মাত্রেই কর্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয়, যে বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে; কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজি নবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাম্বীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ ইহার পূর্ব শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, “The Vedas...pres-

cribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

যদি কৰ্ম্মশব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কৰ্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অত্ৰ কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কৰ্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কৰ্ম্ম কিরূপ? কাম্যকৰ্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৰ্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকৰ্ম্ম বুলিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কৰ্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কৰ্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কৰ্ম্মযোগ"। ইহাতে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ । ৫

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য করে।"

এখন, দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কৰ্ম্ম বলি—

যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল একথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অথু কোন কাজ না করুক স্বভাব বা প্রকৃতির (Nature) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা, অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস, ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কৰ্ম্মশব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কৰ্ম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে।

নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়োহকৰ্ম্মণঃ ।

শরীরযাত্ৰাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্ম্মণঃ ॥

“তুমি নিয়ত কৰ্ম্ম কর ; কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; অকৰ্ম্ম তোমার শরীরযাত্ৰাও নির্বাহ হইতে পারিবে না ”

এখানেও, নিশ্চিত কৰ্ম্ম শব্দ, সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্ম বা “কাজ” ;— যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্ৰা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কৰ্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্ৰা নির্বাহ হয় না।

এংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। * প্রমাণ নির্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিম্নয়োজনীয়।

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজিতঃ” ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার

অতএব ইহা সিদ্ধ, যে কর্মযোগ ব্যাপ্যায় কর্ম অর্থে বাহ্য সচরাচর কর্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ, বা acción, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে ।

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে, যে কর্তব্য কর্ম সকল করিতে হইবে । কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে । এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক ।

ইহার ভিতর দুইটা আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম করিতে হইবে । দ্বিতীয়, সকল কর্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে । এক একটা করিয়া বুঝা যাউক । প্রথম, কর্ম করিতে হইবে ।

কর্ম করিতে হইবে কেন ? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে । কর্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of Life—কর্ম না করিয়া কেহ ক্রণকাল তিষ্ঠিতে পারে না—সকলেই প্রকৃতিজগুণে কর্ম করিতে বাধ্য হয় । কর্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হয় না । কাজেই সকলকে কর্ম করিতে হইবে ।

কিন্তু সকল কর্মই কি করিতে হইবে ? কতকগুলি কর্মকে আমরা সংকর্ম বলি, কতকগুলিকে অসংকর্ম বলি ? অসংকর্মও করিতে হইবে ?

করিতে আমি বাধ্য, যে কখন কখন গীতাতেও কর্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, “দূরেণ হুযয়ং কর্ম” । কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ “কর্মের” শব্দে কর্মযোগের বিরুদ্ধভাব । গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা গুরুই বলিয়াছি ।

অসৎকৰ্ম আমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে ;—অসৎ কৰ্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎ কৰ্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, যে যাহাকে সৎকৰ্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবন যাত্রার নিয়ম ? আমরা কতকগুলিকে সৎকৰ্ম বলি, যথা পরোপকারাদি ;—আর কতকগুলিকে অসৎকৰ্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি ;—আর কতকগুলিকে মদসং কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে, যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰ্মগুলি, করিবার প্রয়োজন নাই ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কৰ্মগুলি না করিলে নয় সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর কৰ্মগুলি করিব কেন ? সৎকৰ্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে ?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধৰ্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি, যে যাহাকে আমরা সৎকৰ্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন নির্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ, কৰ্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকৰ্ম বলি, আর যাহাকে মদসং কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদ্ব্যতীত মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্ত এই

হইকে আমি ধর্ম্যতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়াছি। এই টীকাক্ত ও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম, এই গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্যতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম করিবে,” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম করিবে তাহা নিকাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, যে আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যাশাপূর্ণ করিবে। ইহা সকাম কর্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে। যে ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ম, এবং তাহাও এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন, যে ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিকাম কর্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিকামকর্মা তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না কেবল আপনার অন্তর্থেয় কর্ম করিতে চাহে । পরোপকার আমার অন্তর্থেয় কর্ম— এই জ্ঞান আনি করিব, কোন ফলই চাই না । ইহা নিকাম চিত্তভাব ।

ধর্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অন্তর্থেয় কর্মই নিকাম হইতে পারে । অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক ।

নিকাম কর্ম সম্বন্ধে এইটী প্রথম কথা । এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে ।

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া, কর্ম কর । সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুলা জ্ঞান করিয়া (কর্ম কর) । (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে ।

পূর্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বে কর্ম তাহাই বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে সেইরূপ কর্ম করার পক্ষে, তিনটী বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে ।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে ।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে ।

ক্রমশঃ এই তিনটী বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক ।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে । যোগ কি ? যোগ শব্দ গীতার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বে

বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না, যে যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না।

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈক-পরতা।” শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্ কুরু কৰ্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।” কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোহসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুৰ্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।”

স্থূলকথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশঃ।” আমি কৰ্ত্তা এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরশ্রমে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কৰ্ত্তা, ইহা জানিয়া কৰ্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্ কৰ্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীথরো মে তুষাভিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা,” কেবল ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্তু আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে ‘সঙ্গ’ শব্দ পুনঃপুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

একণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কৰ্ম্মসিদ্ধি, এবং কৰ্ম্মের

অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা, জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কৰ্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন, যে “সত্ত্বগুণিজ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ।” এবং “তদ্বিপৰ্য্যায়জ্ঞানাসিদ্ধিঃ।” শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তী। তিনি বলেন, “কৰ্ম্মফলশ্রু জ্ঞানশ্রু সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ” ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কৰ্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদের পরম লাভ হইবে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, “সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বেন ফলসিদ্ধৌ হৰ্ষং ফল্যাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্তুঃ।” ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হৰ্ষত্যাগ, এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিকাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হৰ্ষ হইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যতদিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে সে ফলকামনা করে—কেন না ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হৰ্ষলাভ করিবে কেন। কৰ্ম্মচারী নিকাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হৰ্ষ নাই, বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হাবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাঙ্কনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমসিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগ হইতে কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট । বুদ্ধিতে
আশ্রয় প্রার্থনা কর । যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট ।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা পূর্বে কথিত হয় নাই । শ্রীধর
বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কৰ্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ । শঙ্কর
বলেন, সমত্ত্ববুদ্ধি । সমত্ত্বং যোগ উচ্যতে । তাহা হইতে কৰ্ম্ম
অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে, এখানে
কৰ্ম্ম শব্দে কাম্য কৰ্ম্ম । ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন । অতএব
শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে কৰ্ম্মযোগের কথা বলিলাম,
তাহা হইতে কাম্য কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট ।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে, যে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ
কর ; বা বুদ্ধির অন্তষ্ঠান কর । ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্দে ঐ
বুদ্ধিযোগই বুদ্ধিতে হয় । ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান ।
যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত ।
তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে “জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে
মতা বুদ্ধির্জানর্দন ।” ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ
হইবে না । কিন্তু পরবর্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ
বাধিবে ।

বুদ্ধিযুক্তো জহঁতীহ উভে স্কৃতদ্রুত্বে ।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কৰ্ম্মসু কোশলং ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি স্কৃত দ্রুত উভয়ই পরিত্যাগ

করেন । তজ্জন্যা, তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর । কৰ্ম্মে কৌশলই যোগ ॥ ৫০ ॥

“বুদ্ধিযুক্ত”—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কৰ্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই স্মৃকৃত । আর সে সকল কৰ্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্টকৃত । যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কৰ্ম্মই পরিত্যাগ করেন । ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে, যে তিনি কোন প্রকার সংকৰ্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কৰ্ম্মই করেন না । ইহার অর্থ এই যে তিনি স্বর্গাদি কামনা, বা নরকাদির ভয়ে কোন কৰ্ম্ম করেন না । যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন ।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর । কৰ্ম্মে কৌশলই যোগ । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথাই এই অর্থ করিয়াছেন যে, কৰ্ম্ম, বন্ধনজনক, কেন না কৰ্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয় । কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাদনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কৰ্ম্মে কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায় ।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি । আমরা বুঝি, যিনি কৰ্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম সকল যথাবিহিত নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী । কৰ্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ।” এ কথাই এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় । যেখানে সহজ অর্থ আছে সেখানে, ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়-দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্তী হইব ।

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনৌষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়পদ প্রাপ্ত হয়েন ।

“বুদ্ধিযুক্ত”—বুদ্ধিযোগাবলম্বী ।

অনাময়পদ—সৰ্বদোষদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ । (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্য্যতিতরিয়্যতি ।

তদা গন্তাসি নিৰ্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্ত চ ॥ ৫২ ॥

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে ।

এই ফল কামনা পরিত্যাগপূর্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায় ? যখন, মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনাশূন্যতা জন্মে । স্বর্গাদিসুখ, বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্থতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্তসি ॥ ৫৩ ॥

তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৫৩ ।

“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” । বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্লিপ্ত । * কিন্তু শ্রুতি কি ? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে

বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং এখানে ক্ষতি শব্দে “বাহ্য শুনা গিয়াছে,” তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—ক্ষতি শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” ক্ষতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশির ভাগ। তিনি বলেন “ক্ষতিবিশ্রুতিপন্থা অনেকসাধাসাধনসম্বন্ধপ্রকাশন-ক্ষতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্থা।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদিকার্থ-শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্থা।”

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পণ্ডিত মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

“I, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিত্) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. (শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও একথা বলিয়া থাকেন)। I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought and thus while I have sometimes followed their

guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author, I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgement."

এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকেই উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতার স্বলেন, যে—

"Here the reference is to *Sruti*, which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (*yogin*), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস একজন ক্ষুদ্রপ্রাণী—তঁাহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিশ্রুতিপন্থা" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তঁাহার পথে গিয়াছেন। তন্নিম্ন ডেবিসের আত্মপ্রাণের ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে তদানীং ছিল না, ও এখনও নাই। "FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই

আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মপ্লাব উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা” ভিন্ন আর একটা মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি”।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অৰ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অৰ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধীব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন? ৫৪।

ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্ এক্ষণে অৰ্জুনকে কর্মযোগ বুঝাইলেন। কর্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন, যে কর্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অগ্রত্রেই হউক) শুনিয়াছে, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন

তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বা স্থিতবী বলা যায় । অর্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জিত হয়, আপনাতে বা (অত্মাত্মে) আপন তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রতিজ্ঞ বলা যায় । ৫৫ ।

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই । যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল ? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিস্পয়োজন । বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে ।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সম্মুখ । আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ । তিনি পরমানন্দ । কিন্তু বহির্জগৎ ঈশ্বর হইতে বিবুক্ত নহে । কামনাশূন্য হইলে বহির্কিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন ? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না ? না জনাৰ্দ্দনে আনন্দ লাভ করে না ? না সংকর্ষসম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না ? কৰ্ম্মের অহুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না । এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে ।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই

সকল উক্তি এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্তী কয়টা শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্দিষ্ট উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কাশনা ও ইজ্রিয়ারদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক সুখ সকলের উপভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুপময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মনঃপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষু দুঃখমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

নীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীর্শু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাহার, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায় ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশক (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী, কেন না সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবর্তী হয় না, ফলবর্তী হইলেও আশাত্তরূপ ফল ফলে না ; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল

ଏକାକୀ ଅମୁରାଗ ବୁଦ୍ଧା ଉଚିତ ନହେ । ଯଥା ଶ୍ରୀମଦ୍‌ରାମାୟଣ—ହା କଥନ
ନିଷିଦ୍ଧ ହୁଏତେ ପାରେ ନା । ଅମୁରାଗ ଅର୍ଥେ, ଏଥାନେ କେବଳ କାମ୍ୟ
ବସ୍ତୁତେ, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁତେ ଅମୁରାଗି ବୁଦ୍ଧିତେ ହୁଏ ।
ତାଦୃଶ ବିଷୟ ସକଳେ ଅମୁରାଗ ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାହା ଆବାର
ବଳିତେ ହୁଏ ନା ।

ବଳିତେ କେବଳ ବାକି ଆଛି, ଯେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯାଗ କରିଲେ
ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରା ହୁଏ ନା । ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯାଗ ଭିନ୍ନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ-
ତା ଯାଗ ଏଥାନେ ବିହିତ ହୁଏତେ ନା । ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେ
ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରିତେ ପାରେ, ଏବଂ କରିବା ଥାକେ । ସ୍ବୟଂ
ଜଗଦୀଶ୍ବର ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଅଥଚ ଅନନ୍ତଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା । ତବେ
ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏହି ଆପତ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏତେ ପାରେ ସେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା
ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହୁଏଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯାଗ କରିବେ ନା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯାଗ କରିବେ
ନା କରିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରେ ନା । ଯିନି କର୍ମଯୋଗ ବୁଝିଛନ୍ତି,
ତିନି କଥନ ଏହି ଆପତ୍ତି କରିବେ ନା । କର୍ମଯୋଗେ ମର୍ମ ଏହି
ସେ, ନିକାମ ହୁଏ କର୍ମ କରିବେ । କର୍ମର ଫଳ ହୁଏ—ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା
କର୍ମ ଅନିର୍ବାହ କରେ, ସେ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରେ । ସେ କାମନା
ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହୁଏ କର୍ମ କରେ, ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରେ ନା—
କାମନା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କର୍ମର, ଅତରାଂ ପାପେର ଓ ଦୁଃଖର
କାରଣ ହୁଏ ଥାକେ । ଅତଏବ ନିକାମ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହୁଏ
କର୍ମ କରିବେ—ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସିବେ । ୧୦ ଶ୍ଳୋକେ ଗବତ୍‌ ସ୍ବୟଂ
ତାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ପରେ ଦେଖିବ ।

ଯଃ ସର୍ବବ୍ରାଜାତୀୟେହସ୍ତନ୍ତଃ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ।

ନାଭିନନ୍ଦତି ନ ଦେଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୧୧ ॥

যিনি সর্বত্র স্নেহশূন্য, তত্বেষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদেযযুক্ত হন না, তিনিই, স্থিতপ্রজ্ঞ । ৫৭ ।

“সর্বত্র স্নেহশূন্য ।”—“শ্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না ‘পুত্রমিত্রা-
দিষপি ।’ শঙ্কর বলেন, “দেহজীবিতাদিষপি ।” শঙ্করের
ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় । দেহ জীবনাদির শুভাশুভে
যাহার কোন আনন্দ বা বিদেয নাই, তাহারই বুদ্ধি বেঙ্গখরে
স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না । ৫৭ ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ যেন সৰল বস্ত হইতে আপনার অঙ্গ সৰল সংহরণ
করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সৰল
সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না । ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন
কোনপ্রকার ধৰ্ম্মাচরণ নাই ; ইহা সৰল ধৰ্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা,
সৰল ধৰ্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান । * সৰ্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়-
সংযমের কথা । কেবল এই কূর্মের উপমার প্রতি একটু

* All ethical gymnastic consists therefore singly in the subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality ; a gymnastic exercise rendering the will hardly and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad.—*Kant-Metaphysics of Ethics*—translated Semples.

মনোযোগ আবশ্যক । কুর্শ্ব তাহার হস্তপদাদি সংলুত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্বাহ করে । ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই । ইহার সংঘমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে । ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি ।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

বসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না । (কেবল) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । ৫৯ ।

“নিরাহার”—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত ।

মনের একটী অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, ছুঁড়াগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন । যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই সুতরাং উপভোগ নাই । কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই । ছুঁড়াগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই । লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না । তার পর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পানের স্রোতে সব ভাসিয়া যায় । ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগ-রত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প । এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জয় । কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয় । “পরং-দৃষ্ট্বা” এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে, যে ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে ।

ধর্মের এই বিষয় এমন গুরুতর যে ভগবান্ পরবর্তী কয়
শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন ।

যততোহপি কোন্তেয় পুরুষশ্চ বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনী হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেইন্দ্রিয়ানি তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

হে কোন্তেয় ! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী
ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্নক চিত্ত হরণ করে । ৬০ ।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর
হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, তাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত
হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ । ৬১ ।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা । যিনি
বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে
পারেন না, বলপূর্নক ইহারা চিত্তকে হরণ করে । আর যাহারা
যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে
কেবল সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ
ঘটে । সেই কথা পরবর্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে আসক্তি

জন্মে । আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২ ।

ক্রোধ হইতে সান্ধোহ হয়, সান্ধোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ । স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩ ।

যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে । আসক্তি জন্মিলে* তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে । না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয় । ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে । এক্রপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয় । কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল । বুদ্ধিনাশে বিনাশ ।*

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া যাইবে না । তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ ? যদি তাহা হয়, তবে এই নীতোক্ত ধর্ম্ম asceticism † না ত কি ? তাহা হইলে জনসমাজকে সম্মানসীল মঠে পরিণত করিতে হয় ।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগনিষিদ্ধ নহে ; তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে ।

* নীতারামের চরিত্রের বর্তমান লেখক এই কথা শুনি উদাহরণের দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে যত্ন করিয়াছেন ।

† আমরা যাহাকে বৈবাগ্য বা সংস্থাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিষ । এই জন্ত ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি ।

রাগদ্বेषবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অহুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন ।

বিধেয়াত্মা—যাহার আত্মা ও অন্তঃকরণ বশবর্তী ।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আত্মাধীন—বলের দ্বারা তাহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না । তাহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অহুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয় সকল তাহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন । ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * লাভ করেন । অর্থাৎ তাহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ । তাই বলিতেছিলাম, যে গীতোক্ত এই ধর্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম । বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিবদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে ।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে । বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে “রাগদ্বেষ বিমুক্ত”—অহুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে । বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অহুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিম্নয়োজন । কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি ? ভোগ্য বিষয়ে অহুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না । যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি ? আর যদি উপভোগ্য

* “Makes the heart glad.”—পূর্বোক্ত কাস্তুর উক্তি দেখ ।

বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদেষ ঘটে, সেত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সূত্রে প্রবৃত্তি থাকিবে না । তবে এ নিবেদ কেন ।

উপভোগ্যে যে বিদেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহায়ে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসূত্রে অরুচি, উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে । অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধূতি পরিবেন না, চটিজুতা নহিলে পারে দিবেন না । ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই । যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধূতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না ।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে । একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি । রোমান ক্যাথলিক ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে । এইজন্ত তাঁহাদের মধ্যে চিরকোমার বিহিত ছিল । ইহার ফলে কিকরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন । কিন্তু অর্ঘ্য ঋষিরা যথার্থ স্থিত-প্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদেষও নাই । অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দার-পরিগ্রহ করিতেন । কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্যতঃ সন্তানোৎপাদন জন্তই বিবাহ করিতেন । এবং সেই জন্ত স্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না ।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও বিরোধী। কেন না Puritanism এই “বিদ্বেষ”-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়।

পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে আত্মবশ্ত ও রাগদ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত, বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্য কুতঃ স্নখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। বাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; বাহার শান্তি নাই, তাহার স্নখ নাই।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা।

বাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। বাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন,

আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই ; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই ।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে । অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন । তবে সে বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণাদিগকে কখন স্থগী করে না । যে বুদ্ধিতে স্থগী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে । ৬৭ ।

টীকার প্রয়োজন নাই ।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো ! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব প্রকারে নিম্নগীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ।

টীকার প্রয়োজন নাই ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত । সর্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাগাই রাত্রি । ৬৯ ।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা।
“অদ্বানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ একনিষ্ঠাতে
জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়-
নিষ্ঠাস্বরূপ দিব্য প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের
সেই রাজি।”

আপূর্য্যমাণমতলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বৈ

স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

যেমন পূর্য্যমান হিত্রপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে,
সেইরূপ ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি
প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন, তিনি
পান না।

সমুদ্র, জলের অঘেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে
জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি
যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই
তাহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন।
যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত স্ত্রৱাং কামনাপরবশ, তিনি সে শাস্তি কদাচ
লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি,
তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কৰ্ম্মফলজনিত সুখলাভের
কারণ। কৰ্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাহাকে আপনি আশ্রয়
করে; তাদৃশ সুখই শাস্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শাস্তি
নাই; স্ত্রৱাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যিনি সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন,
যিনি মমতামূল্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন ।

মমতামূল্য—আত্মাভিমানমূল্য ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।

স্থিরাহস্তামন্তুকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা । ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ
হইতে হয় না । কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও
ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৭২ ।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিত্তর আসিল । ইন্দ্রিয়সংযম
এবং কামনাপরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা । স্মরণ রাখিতে হইবে, যে
ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন
কামনাত্যাগ ঘটে না । অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে
ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা । ইন্দ্রিয়সংযম এবং
ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্মের অহুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ
ব্রহ্মনিষ্ঠা ।

ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল । ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ ।
গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—
অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্ব্বাচন মাত্র । হিন্দুধর্মে বা অপর কোন
ধর্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ
নহে । তাহা হয় উপহাস, নয় উপধর্ম, নয় সামাজিক নীতি,
নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল । ইহা সকলের আয়ত্ত,

ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা গায়ত্রীর আবশ্যক নাই । স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত । ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম—
ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্ম-

বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাদিন ।।

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ! ॥ ১

হে জনাদিন ! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব ! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? । ১

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে । ভগবান্ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ করেক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জুন এইরূপ বুঝিয়াছেন, যে জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে যদি জ্ঞানই কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্মে বিশেষ যুদ্ধের ছায় নিকুণ্ঠ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?

অর্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, “অশোচ্যাননশোচন্তুম্” (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষসাধনজন্তু দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে । কিন্তু এতদ্ব্যতীত মধো গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই । তথা বুদ্ধিবৃত্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেজ্জিগ্মত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও

কর্ম এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই, যে কর্ম চইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে,

“দূরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাঙ্গিনশ্চয়।”

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াস্থিক। কর্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকার “দূরেণ হবরং কর্ম” ইত্যাদি শ্লোকটী বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্মের গুণপ্রাধান্ত সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদ্বক্তি বাহা আছে, তাহা কিছু “ব্যামিশ্র” (*anglice ambiguous*) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্বকই ভগবান্ কথা প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্তমঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে একরূপ সর্বমঙ্গলময় ধর্ম কথিত হয় নাই।

অর্জুন সেই “ব্যামিশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য, যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছে। অতএব যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও । ২ ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

হে অনঘ ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যাদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কৰ্ম্ম) যোগীদিগের কৰ্ম্মযোগ বলিয়াছি । ৩ ।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই ।

ন কৰ্ম্মণামনারম্ভানৈকৰ্ম্ম্যাং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

এই কৰ্ম্মের অনুরূপানেই পুরুষ নৈকৰ্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর, কৰ্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না । ৪ ।

অৰ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কৰ্ম্ম হইতে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, তবে কৰ্ম্মে নিয়োগ করিতেছে কেন ? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে, কি তোমাকে কৰ্ম্মত্যাগ করিতে বলিতে হইবে ? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কৰ্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে ? তুমি

কোন কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈকর্ম্য প্রাপ্ত হইবে ?
না নৈকর্ম্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ?

কর্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈকর্ম্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্ বলিতেছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈগুর্নৈঃ ॥ ৫ ॥

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ।
প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় । ৫ ।

হে অর্জুন ! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমি
তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে
পার কৈ ? প্রকৃতি ছাড়াই কৈ ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, অশন, শয়ন,
স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি ? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ
সকল ত্যাগ করা যায় কি ?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির
বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে ; কিন্তু
যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাবীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী
পরিত্যাগ করিতে পারেন না ?

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্টেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ
করিতে পারে না । ঈশ্বরচিন্তা স্বৈচ্ছাবীন কর্ম্ম, ইহা কি
জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে ? তবে জ্ঞানের
উদ্দেশ্য কি ?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার
কথা হইতেছে না । হিন্দুশাস্ত্রে শ্রোত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই

কৰ্ম বলে । কিন্তু ইহা সত্য নহে শ্রোত কৰ্ম ও স্মার্ত কৰ্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয় । অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কৰ্ম বলে—যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে । ইহা আমি পূৰ্বেও বলিয়াছি এক্ষণেও বলিতেছি । গীতার ব্যাখ্যায় কৰ্ম বলিলে, কৰ্মমাত্রই বুঝিতে হইবে ; কেবল শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে ।

কৰ্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কৰ্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী । ৬ ।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে কৰ্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্কৰ্ম্য পাওয়া যায় না এবং কৰ্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না । কৰ্মের অননুষ্ঠানে যে নৈষ্কৰ্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন, যে তুমি কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কৰ্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে । আর কৰ্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন, যে কৰ্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, “কৰ্ম করিব না” বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে আসিয়া উদ্ভিত হইতে পারে । তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র । তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ।

যদি কৰ্মত্যাগও করা যায় না, এবং কৰ্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অর্জুন ! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা কর্মযোগের অহুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭ ।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্দেদ কর্মণঃ ॥ ৮ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম করিবে । কর্মশূন্যতা হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ । কর্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না । ৮ ।

“ত্বং কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব !” অর্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন । উত্তর এই, যে কর্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না । কর্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্ভাবনা নাই । অতএব কর্ম করিবে । তবে যদি কর্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে । কর্ম বাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত হইল । প্রথম, ইন্দ্রিয় সকল * মনের দ্বারা সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবে । তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে । তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং কর্মযোগের কেন্দ্রীভূত । তাহা পরবর্তী প্লোকে কথিত হইতেছে ।

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ।

যজ্ঞার্থাং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থে যে কৰ্ম, তদ্ভিন্ন অন্যত্র কৰ্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ ।
হে কৌন্তেয় ! তুমি সেই জ্ঞাত (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কৰ্মানু-
ষ্ঠান কর । ৯ ।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে ।
সচরাচর, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্বে যজ্ঞ বলিত,—যথা
অশ্বমেধাদি । এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই
যজ্ঞ বলে ।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না ।
শঙ্কর বলেন,—“যজ্ঞো বৈ বিশ্বরূপিত্যে ক্রতেষু জৈশ্বরঃ” । শ্রীধর
সেই অর্থ গ্রহণ করেন । মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন ।
রামানুজ তাহা বলেন না । তিনি দ্রব্যাজনাদিক কৰ্মকে
যজ্ঞ বলেন না ।

শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের
অর্থ এইরূপ হয়, যে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কৰ্ম, তাহা
কেবল কৰ্মফল ভোগের জন্ত বন্ধন মাত্র । অতএব অনাসক্ত
হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই কৰ্ম করিবে ।

তাহা হইলে, বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাদনার্থ
যে কৰ্ম তাহা ভিন্ন অন্য সকল কৰ্ম কৰ্মফলভোগের বন্ধন মাত্র ।
অতএব কেবল ঈশ্বরারাদনার্থই কৰ্ম করিবে ।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয় ? ভগবান্‌ই
স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিত্যাগিত হইয়া এবং

জীবনযাত্রা-নির্সাহার্থও কৰ্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল 'কৰ্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা নির্সাহার্থ স্নানপান আহার-ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুঝিবার জন্ত, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্ততি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদপ্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্ততি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ কি চিন্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্ততি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ “বাগ যজ্ঞ” বলে, পুষ্প, চন্দন নৈবেদ্য হোম বলি উৎসব এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

“সৰ্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত।

সমস্তমারাধনমচ্যুতস্ত ॥”

সর্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। আমরা ক্রমশঃ

ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাদনাও তাই—সৰ্বভূতে সম-
দৃষ্টি, সৰ্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সৰ্বভূতের হিতসাধন ।

অতএব কৰ্ম্মযোগীর কৰ্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সৰ্বভূতের
হিতসাধন ।

যে কৰ্ম্মকর্তা সে নিজের সৰ্বভূতের অন্তর্গত । অতএব
আত্মরক্ষাও ঈশ্বরভিষেক । জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকল-
কেই নিজের উপর দিয়াছেন । এ সকল কথা আমি সবিস্তারে
ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই ।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে, যে “যজ্ঞ” (যে অর্থেই
হউক) ভিন্ন অত্ৰ কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র । “বন্ধন” কি, এইটা
বুঝাইতে বাকি আছে । অত্ৰবিধ কৰ্ম্ম নিফল হয় বা পাপজনক
এমন কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে তাহা বন্ধন স্বরূপ ।
এই বন্ধন বুঝিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে । কৰ্ম্ম
করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে । কৰ্ম্মফল—
সুফলই হউক আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্ত,
জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে । যতদিন জন্মের পর
জন্ম হইবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই । মুক্তির প্রতিবন্ধক
বলিয়াই কৰ্ম্ম বন্ধন মাত্র ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যদি জন্মান্তর না থাকে ?
তাহা হইলেও গীতোক্ত নিকাম কৰ্ম্মই কি ধর্ম্মাত্মমোদিত ? না
নিকাম কৰ্ম্মও যা, সকাম কৰ্ম্মও তা ?

আমি ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি । নিকাম কৰ্ম্ম ভিন্ন
মহুষ্যত্ব নাই । মহুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী
সুখ নাই । অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোহস্তি সৃষ্টকামধুক ॥ ১০।

পূর্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে। ১০।

এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দে আর ‘ঈশ্বর’ নহে বা ঈশ্বরারাদনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রীত স্মার্ত কৰ্ম্মই যজ্ঞ। এবং পরবর্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটী শব্দ কোন অর্থ-বিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যাম্বক তেলাঙ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন,—“Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in this passage.” ডেবিস সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ দিকে কামধুকের স্থানে Kamduk লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার!!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কৰ্ম্মের নিন্দা ও নিকাম কৰ্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্ সকাম কৰ্ম্ম করিতে উপদেশ

দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না, যে যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিষ; প্রজাপতি যখন মনুষ্যসৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এই টুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্তন। তার পর, বেদ, নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে, প্রজাপতি যে প্রজাসৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্তী কয়েকটা শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

পুনশ্চ লৌকিক বিদ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥ ১১ ।

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ

তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেব-গণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্টাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন।” আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তুস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে তদন্ত (অন্ন) না দিয়া, যে খায় সে চোর ১২।

শঙ্কর শ্রীধর স্বামী বলেন (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পঞ্চযজ্ঞাদিতিরদত্তা,” পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।

হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিভোজনম্ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চযজ্ঞেরদত্তা” বলেন না, “পঞ্চযজ্ঞাদিতিরদত্তা” বলেন।

যজ্ঞশিফাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা য়ে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন । যাহারা কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপভোজন করে । ১৩ ।

অম্নাস্তুবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্মাদমসন্তবঃ ।

যজ্ঞাস্তুবন্তি পৰ্জ্জন্মো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন ; পৰ্জ্জন্ম হইতে অন্ন জন্মে ; যজ্ঞ হইতে পৰ্জ্জন্ম জন্মে । কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি । ১৪ ।

পৰ্জ্জন্ম একটা বৈদিক দেবতা । তিনি বৃষ্টি করেন । এখানে পৰ্জ্জন্ম অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে ।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি । কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং বোধগম্য বাটে । টীকাকারেরা বুঝাই-
য়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে । ইহাই যথেষ্ট ।

তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন । তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে ; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না । কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না । টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে । অল্প ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে । অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে । যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয় । সে বাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না । তবে কি ভগবদ্ভক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক ? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি ।

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঙ্করসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জ্ঞানিও ; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত ;
অতএব সৰ্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত । ১৫ ।

টীকাকারেয়া বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং
অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন, যে
প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে
পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রদয় সিংহের
মহাতারতকার এবং অত্যাণ্ড অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্তী
হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে
বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে—

“কৰ্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ;
অতএব সৰ্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের মতে—

“কৰ্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ;
অতএব বেদ সৰ্বার্থপ্রকাশক হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত
আছেন।”

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ;
মূল তাৎপৰ্য্যের বিষয় কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নামুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ প্রবর্তিত চক্রের যে অনুবর্তী না হয়, সে পাপজীবন ও
ইন্দ্রিয়রাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬ ।

(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়রাম ।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কৰ্ম, কৰ্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন অন্ন হইতে জীব। টাকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কৰ্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্তন করা হইল। কেন না, কৰ্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের একভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না আমরা জানি কৰ্ম করিলেই যজ্ঞ* হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্ত্র হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্ত্র হয় (যথা রবিখন্দ), শস্ত্র বিনাও জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতি মুগয়া বা গুপ্তপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কৰ্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্মতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর, বেদ হইতে কৰ্ম, এ কথা কেবল শ্রোত কৰ্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কৰ্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই

* যদি বল, শ্রোত স্মার্ত কৰ্মই কৰ্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কৰ্ম নাই, তাহা হইলে “ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকৃৎ, (৫ম শ্লোক), এবং “শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যাদকৰ্মণঃ (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি । সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (unscientific) কথা । এখানে মহর্ষিভূলা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন ; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন । আমরা স্নেচ্ছের শিষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই । তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব, যে গীতা, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে । বিসুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার জ্ঞান Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই । তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না ।

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে যাহা তুমি ভগবদ্ভক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত । অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল । ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে ?

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদ্ভক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যে গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদ্ভক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে । আমি বলিয়াছি যে কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অশ্রু কৰ্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে । যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল । তিনি যে নিজসঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে । শ্রীধর স্বামীর ছায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্ত্তা সম্বন্ধে “প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাধিনিঃস্থতানুব শ্লোকানলিখৎ” * ? ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে “কাংশিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ ।” * ? এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম

ধর্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ । এজ্ঞ ইহা ভগবৎকৃতি নহে—সঙ্কলনকর্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস ।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য, যে ইহা যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই । আমি “কৃষ্ণচরিত্রে” দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্ম সকল নির্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে । মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না । কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী, ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব, কেন না কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই—মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না । কেবল মানুষী শক্তির কল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না । ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে ।

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা সপক্ষে আর একটা কথা আছে । মনে কর এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন । এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্বজ্ঞতা প্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন । বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না । তখন হয় ত মনুষ্য জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ঈশ্বরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষিনগল* বা রোহিণী নক্ষত্র† বেড়াইয়া

* Great Boars.

† Plerades.

আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী
কিস্তুত কিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে,
এ বেলা ও বেলা সূর্যালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে
হইবে । মনে কর, ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞতাগ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের
সঙ্গে স্রসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্মতত্ত্ব প্রচার
করিলেন । করিলে, শুনিবে কে ? বুঝিবে কে ? অহুবর্তী
হইবে কে ? কেহ না । এইজন্ত ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী
ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত । তার পর, ক্রমশঃ মানুষের
জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে, সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল
পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে । সেই জন্তই শঙ্করাদি
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ছায় মুখ
অভিনব ভাষা রচনায় সাহসী ।

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই
প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম । দ্বিতীয়
আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে, যে এই সাতটি শ্লোক
গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের বিরোধী । এ আপত্তি অতি যথার্থ ।
তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের
উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের
টীকায় বলিয়াছি । মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা
অপেক্ষাকৃত মঙ্গত বোধ হইতে পারে । পরিত্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাঁহার
কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নামী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত
করিতেছি ।

“সহযজ্ঞ” অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে

সম্বোধন করিয়া প্রজ্ঞাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্মেরই উদ্দেশ্য হইল; কিন্তু “মা কর্মফলহেতুভূঃ” এই বচনে কাম্য কর্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্ত ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। “প্রজ্ঞাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যানুরোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে, তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আত্মেরই জন্ত যখন আত্মবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সঙ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধেই কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না করিলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে! ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও, কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ভ্রাম্য, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতটি শ্লোকের ভিতর একটা রহস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া, ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে,—

সহযজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টৌ পুরোবাচ প্রজ্ঞাপতিঃ ।*

এ কথা গীতাকার নিজের হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মহুসংহিতায় আছে,

কর্মাশ্বনাঞ্চ দেবানাং সোহস্বজ্ঞং প্রাণিনাং প্রভুঃ।

সাধ্যানাঞ্চ গণং সৃষ্ণং যজ্ঞকৈব সনাতনম্ ॥” ১-২২ + ইত্যাদি।

যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদান করেন, ইহা বৈদিক ধর্মের সূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম।

এখন, পূর্বে প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না, যে তাহাতে উপধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একবারে উচ্ছেদ কর্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম নিজে যীশুদা ধর্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপধর্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত দেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন

* ইহার অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

কাজ নহে । পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম, প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই ।

গীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত নহেন । তিনি জানিতেন যে তাঁহার কথিত নিকাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না । তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এজন্ত তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন । যাহারা বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি । কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ; নিকাম কর্ম-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্ত তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন । কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না । তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি ।

যাহারা কর্ম করে (সকলেই কর্ম করে) তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে । প্রথম, যাহারা নিকামকর্মী, এবং যাহারা নিকাম কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরাত” বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্ত কর্ম করে । ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগের “ইন্দ্রিয়ারাম” বলা হইয়াছে । তদ্বিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্মালুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে । দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল । তাহাদের

অনন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে, যে তাহারা “ইল্লিয়ারাম” নহে—প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত । এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব । দেখিব যে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যে আমি ভিন্ন দেবতা নাই । যাহারা অল্প দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে । সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন । কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা ইহাও বলিয়াছেন ।

এখন জিজ্ঞাসা কাহাদের মতটা উদার ? যাহারা বলেন যে অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাহারা বলেন যে বৈধ হউক আর অবৈধ হউক উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য ? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । কাহাদের মত উদার ? যাহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্ত উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না যাহারা বলেন যে ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন ? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে তেমনই উপাসনা করে ।

গঙ্গা, বা Caspian Sea বা আমাদের লালদীঘ সবই জল । কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian Sea ও নহে, বা লালদীঘি নহে । “জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” বলিলে কখনও বুঝাইবে না, যে গঙ্গা মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা Caspian Sea তজ্জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা লালদীঘি তজ্জন্ত প্রয়োজনীয় । অতএব বিষ্ণু সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ

বিষ্ণু, অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ্ণুর্থে” বুঝিতে হইবে, এ কথা খাটে না ।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না এখন দেখা যাউক । আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যায় । সে কথার তাৎপর্য এই, যে, ইন্দ্র এবং অন্ত্রাদি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন । সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু একজন । সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্তু যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন । আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে একজন মাত্র—আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান । শঙ্করাচার্যাকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ” এখন যাহা বলিবেন যে যদি “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না ।

শঙ্করাচার্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ । এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে তাঁহার পাছকা বহন করিবার যোগ্য । তবে, দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে, যে গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য । কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে, বা ঘোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না । পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ

গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয় । তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয় । কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন । এই জন্ত এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । তাহা বলিয়াও পরবর্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই । সে সকলে যজ্ঞার্থে কান্য কর্মই বুঝাইতে হইয়াছে । গীতার এইরূপ কান্য কর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাবো শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবোগ্যতা প্রাপ্তির জন্ত অনাযুক্ত ব্যক্তি কর্মযোগ্য-নুষ্ঠান করিবে । ইহার জন্ত “ন কর্মণামনারস্তাৎ” ইত্যাদি বৃষ্টি পুন্দ্রে কথিত হইয়াছে ; কিন্তু অনাযুক্তের কর্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে ।

ঈশ্বর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তী । তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন । তিনি বলেন যে সাংগত্যতঃ অকর্ম (কর্মশূন্যতা) হইতে কাম্যকর্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত পরবর্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে ।

সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিজে জানিতে পারিবেন । তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা মদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য ।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি ? যজ্ ধাতু দেবপূজার্থে । অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা । যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত,

সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ । কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সৰ্বদেবময়, যথা—

“যেহ্যগ্নদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্তাবিধিপূৰ্বকম্ ॥” ২৩ ॥

গীতা, ৯ অ ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাদনা । ভগবান্ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

“অহং হি সৰ্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।” ২৪ ॥

গীতা, ৯ অ ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাদনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । উপরিধৃত শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে । আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

“ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ।”

গীতা, ২৫, ১০ অ ।

“যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ।”

গীতা, ২৫, ১০ অ ।

অগ্নি গ্রহেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাদনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায় । যথা, মহাভারতে—

“বাক্ষ্যজ্ঞেনার্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনাৰ্দ্দন ।”

শান্তি পর্ব, ৪৭ অধ্যায় ।

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাদনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে ? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, অসঙ্গত অর্থও হয় ।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু

আপত্তি আছে। একটা আপত্তি এই :—এই শ্লোকের পরবর্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর এমন অর্থ বুঝায় না। “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ” “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ” “যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ” “যজ্ঞকর্নসমুদ্ভবঃ” “যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একাধেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। ‘হে যজ্ঞ !’ বলিলে কেহই বুঝিবে না যে ‘হে বিষ্ণো !’ বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষ্ণুর দশ অবতার” এ কথার পরিবর্তে কখনও বল্যা যায় না যে “যজ্ঞের দশ অবতার”। “যজ্ঞ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন, যে যজ্ঞার্থে বিষ্ণু ? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ” যজ্ঞ বিষ্ণু ইহা বেদে আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে * কথিত আছে, যে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

“ভবিষ্ণুঃ প্রথমং জ্ঞাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ।
তস্মাদাহবিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। স বঃ স বিস্বর্যজ্ঞঃ সঃ। স যঃ
স যজ্ঞোহসৌ স আদিতাঃ।”

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।”

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপি বিষয়ঃ” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—“যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ, পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুসু প্রতিষ্ঠতি।† ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি স্মৃতেঃ।”

অতএব শঙ্করাচার্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থ? একটা অর্থ এই হইতে পারে, যে বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না সর্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই

* ১৪।১।১।

† ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু মনোহের বিষয় আছে।

বলিয়াছেন। তিনি বলেন “বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি ঋতেঃ সৰ্ব্বপ্রাণাদ্যন্ত্যামিহেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ।”

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং ।

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥”

গীতা, ৯অ, ১৬ ।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন ।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে । বিষ্ণু সৰ্ব্বময়, এজন্ত তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি ; কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে । অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা খাটে না ।

যন্তাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মান্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাহার কার্য্য নাই । ১৭ ।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম । যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম ; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্ত । এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে ।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, যে কেহই কৰ্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না । কৰ্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্বাহ হয় না । আবার এখন বলা হইতেছে যে ব্যক্তিবিশেষের কৰ্ম্ম

নাই। অতএব কৰ্ম বা কাৰ্য্য শব্দের বিশেষ বুদ্ধিতে হইবে।
বৈদিকাদি সকাম কৰ্ম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে
আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্ম কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্ম সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার কৰ্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কৰ্ম্ম অকরণেও
কোন প্রত্যাবায় নাই। সৰ্ব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার
প্রয়োজন নাই। ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কাৰ্য্য সম্পাদন করিবে।
পুরুষ অসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম করিলে মুক্তি লাভ করে। ১৯।

‘অসক্ত’ অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক
দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া
পড়িলে, এই ‘তস্মাৎ’ (অতএব) শব্দ অতিশয় সূক্ষ্মত হয়।
মধ্যে যে কয়টা শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই ‘তস্মাৎ’ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ
হয় না! ৮ম শ্লোকে বলা হইল, যে কৰ্ম্ম না করিলে, তোমার
শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা
হইল, যে ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অগ্রত্ব কৰ্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র।
অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়া
ঈশ্বরারাদনার্থ যে কৰ্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে।

৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১০শ শ্লোক পড়িলে, এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী নয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কস্মিনৈব হি সংসিদ্ধিমান্স্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুর্মহসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি কস্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কস্ম কর। ২০।

এই ‘লোকসংগ্রহ’ শব্দের অর্থে ভাষাকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম প্রবর্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন, যে লোককে স্বধর্ম প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কস্ম করিলে সকলে কস্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া নিজ ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পর শ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যে যে কস্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাহার যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্তী হয়। ২১।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কস্ম নাই।

এক্ষণে কথিত হইতেছে যে কৰ্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কৰ্ম করা কর্তব্য। কেন না, তাঁহারা কৰ্ম না করিলে, সাধারণ লোক যাহারা আয়ুজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া কৰ্ম হইতে বিরত হইবে। কৰ্ম হইতে বিরত হইলে, স্ব স্ব ধৰ্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কৰ্ম করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞান-মার্গাবলম্বীর কৰ্ম নাই ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কৰ্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কৰ্মে অনুরাগশূন্য সূত্রাং অকৰ্মী লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কৰ্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্তী হইয়া কৰ্ম করিলে, জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না—পরাদীন, পরমুখপ্ৰেক্ষী, পরজাতিদত্ত-শিক্ষাবিপদগ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কৰ্মের মহিমা কীৰ্ত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে। মহাভারতে উদ্যোগপর্বে সঞ্জয়যান-পৰ্ব্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থাস্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম :—

“সুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কৰ্মবশতঃ,

কেহ বা কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কৰ্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোনও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা শাস্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কৰ্ম্মের ফল প্রত্যাক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয় ! কৰ্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কৰ্ম্মই সৰ্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম অপেক্ষা অথ কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল হয়।

“দেখ, দেবগণ কৰ্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কৰ্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কৰ্ম্মবলে আলোকশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কৰ্ম্মবলে নক্ষত্র-মণ্ডলীপরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হতাশন কৰ্ম্মবলে প্রজাগণের কৰ্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কৰ্ম্মবলে নিতান্ত দুৰ্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। শ্রোতস্বতী সকল কৰ্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কৰ্ম্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অগ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসৰ্জন ও প্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া

শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অশ্বর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কস্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্ত্যাত্ম ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।”

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কস্ম করা কর্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কস্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্ত নিজের কথা বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কস্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হুং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কস্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।

মম বত্সানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কস্ম করিয়া থাকি। ২২।

কস্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কস্ম না করি, তবে হে পার্থ ! মনুষ্য সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমায়ই পথের অনুবর্ত্তী হইবে। ২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, স্তম্ভ হুং স্তম্ভ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কস্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন

এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে ; তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্ত তাঁহার কৰ্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্ত ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে, তিনি মনুষ্যধৰ্ম্মী বলিয়া তাঁহার কৰ্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধৰ্ম্মিহেতু কৰ্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কৰ্ম্মী। অতএব তিনি কদাচ আলস্তপরবশ হইয়া কৰ্ম্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্তনে অলস ও কৰ্ম্মে অমনোযোগী হইবে। যে অলস ও কৰ্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম্ম চেদহম্।

সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

যদি আমি কৰ্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক সকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কৰ্ত্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিগ্ৰহেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধিরক্ষার জন্ত অতিশয় যত্নশীল ; এজন্ত বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে,—

“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্ত চ।”

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না, যে সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরে আলস্তে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না, যে ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাক্ষ্য নিবারণ করেন। হর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, তপস্তা প্রভৃতি ধর্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্তে এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাক্ষ্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত দ্রুত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সম্ভ্রমণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আনাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাক্ষ্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই আমি বুঝি, যে তিনি কৰ্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্তপরবশ এবং কৰ্ম্মে অমনোযোগী হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব।

সন্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্যাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।

কুর্য্যাদ্ধিবাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ব্বলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কৰ্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া

কর্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম করে ; বিদ্বানেরা লোক-রক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

বিদ্বানেরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব কর্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে আমাদিগেরও এই সকল কর্ম কর্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ববশঃ।

অরুদানানি ন চাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্ত্বমহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মদ্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণকর্মবিভাগের তত্ত্ব যাহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্তমান; এজন্য তাঁহারা কর্মে আসক্ত হন না।

যাঁহার শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহার উপরি-
 ব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের অর্থ বুঝিবেন না । ঐ দুই শ্লোক এবং
 তৎপূর্বে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে
 ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া । যাঁহার
 আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে শরীর হইতে পৃথক্
 অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা
 হইতেছে । বলা হইতেছে যে অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কর্মে
 আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীরা কর্মে অনাসক্ত
 বা ফলকামনাশূন্য । কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন ? আত্মজ্ঞান
 থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই
 ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই
 শ্লোকে বুঝান হইতেছে । ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই
 বিষয় বলে । কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় । ইন্দ্রিয়ে ও
 বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম । যাঁহার আত্মজ্ঞান
 নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে ইন্দ্রিয়ে ও
 বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল ; অতএব আমিই
 কর্মের কর্তা । “আমিই কর্মের কর্তা” এই বিবেচনাই অহঙ্কার ।
 সে বুঝে যে আমি কর্ম করিয়াছি, এজন্ত আমিই কর্মের ফলভোগ
 করিব ; তাই সে ফলকামনা করে । আর যাঁহার আত্মজ্ঞান
 আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, ইন্দ্রিয় সকল আত্মার
 কোন অংশ নহে ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে ইন্দ্রিয়
 বা প্রকৃতিই কর্ম করিল । কেন না, তদ্বারাই বিষয়ের সহিত
 ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত হইল । আত্মা কর্ম করেন নাই,
 স্ততরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন । আত্মাই আমি, অতএব

আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাঁহারা ফলকামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞানী নিকাম কর্মের মূল। এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম নিকাম হয় না, এবং নিকাম কর্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিকাম কর্মও কর্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে কথিত হইতেছে কর্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নিদ্রিষ্ট হইল।

প্রকৃতে গুণসংসূচাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিনুত, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্মে অহুরাগ-যুক্ত হয়। সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফল এমত ঘটিতে পারে, যে তাহারা সকাম কর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিকাম কর্ম সম্ভবে না; এই জন্ত তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সর্ববাণি কর্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূহা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিম্পৃহ মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল, যে অৰ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপকর্মের দ্বাৰা রাজ্যাভ্যাস করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদন্তরে ভগবান্ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর, কর্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য কর্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অতঃ কর্ম না করিলেও, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কর্ম করিতে হয়। তবে বাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূৰ্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সাকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্মই পরম ধর্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যাভ্যাস হইবে বা না হইবে সে চিন্তা না করিয়া, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া নির্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে ত্বেতদভ্যাসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।

সর্ববিজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্ঠানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা অসূয়াপরবশ্ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে

না, তাহাদিগকে সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও । ৩২ ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্থাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল সেইরূপই চেষ্টা করে । জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয় । নিগ্রহে কোন ফল হয় না ।

ইন্দ্রিয়স্তেজস্বিন্যস্তার্থে রাগদ্বেষো ব্যবস্থিতৌ ।

তয়োৰ্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যজ্ঞাবী । তাহার বশগামী হইও না ; কেন না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক । ৩৪ ।

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্নুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

পরধৰ্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধৰ্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল । বরং স্বধৰ্ম্মে নিধনও ভাল, পরধৰ্ম্ম ভয়াবহ । ৩৫ ।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মৰ্ম্মার্থ বুঝাইতেছি । সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য তাহাই করিয়া থাকেন । নিষেধ বা পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত বা স্তম্ভক করা যায় না । কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধৰ্ম্মের অনুসরণ

কুরিয়া থাকে । স্বধর্ম কি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি । বর্ণাশ্রম-ধর্মই যে স্বধর্ম, এমন অর্থ করা যায় না । কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয় । কিন্তু ভগবদ্বক্তা ধর্ম সার্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিভ্রাণের উপায় । অতএব স্বধর্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে, যে ইহজীবনে যে, যে কর্মকে আপনার অন্তর্ভেদে কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম । যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে প্রভেদ এই, যে বর্ণাশ্রমধর্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অন্তর্ভেদে কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । অত্র সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয় । শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্মই লোকের অনুকূল । কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া ধনাদির লোভে বিমুক্ত হইয়া, স্বধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক লোকে পরধর্ম অবলম্বন করে । তাহাদের প্রায় বোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে । প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সন্দেহেই বুঝেন । কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্মত্যাগ এবং পরধর্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই । যে সকল পুরুষ স্বধর্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জ্ঞাত প্রাণপণ যত্ন করেন, এবং তাহার সাধন জ্ঞাত মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন । এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাঁহারা ইহলোকে যথার্থ সুখী হইবেন । কিন্তু

পরধর্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয় এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপধরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছনপি বাশেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

পরে অর্জুন বলিতেছেন—

হে বাশেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিরোগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬।

পূর্বে কথা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বेष অবশ্যস্তাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই একরূপ কথায় বুঝায়। অর্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কেন একরূপ ঘটিয়া থাকে? কে একরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপুা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অভ্যুগ্র। ইহালোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি, তাহা

স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে।
কাম দুষ্পূর্ণীয়, এজন্য মহাশন ।

পাঠক দেখিবেন, যে কাম, ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ
হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায়,
যে কাম ও ক্রোধ একই; দুইটী পৃথক্ রিপূর কথা হইতেছে
না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে কাম প্রতিহত হইলে
অর্থাৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ
একই।

তবে কথাটা এই হইল, যে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা
সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের
বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্ম্মাশ্রয় করে;
পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম
অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মাত্তরেরই বিষয়া-
কাজ্ঞা বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে
পারা যাইবে।

ভগদাক্যের ষাথার্থ্য এবং সার্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী
দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটা উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম্ম, রাজ্যাশাসন ও প্রজাপালন। তিনি
ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে
ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ
ধর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল
ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ,
St. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং স্পেনের
Inquisition এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত

আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Netherland দেশে দশলক্ষ মানুষ, কেবল রাজার ধর্ম হইতে ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল । আজ কাল, ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে, রাজার এক্রূপ পরধর্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে, ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত ?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে রাজার ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম ; বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম । রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন । ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ । বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পটুবস্ত্র, রেশম, পিতল কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে গেল ;—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্তের হাতে গেল ; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল, যে আর উঠিল না । কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল । মানুষ সব ছাড়ে—আফিস ছাড়ে না । সে বাণিজ্যের এখনও আফিসটুকু আছে ।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্বীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে প্রবৃত্তি । ইহাতে ঘটিতেছে, স্বীজাতির বৈবয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় লুপ্ত হানি । যে স্বীলোক স্বগর্ভ সমুত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থ, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহনরণাভিলাষিনী হিন্দুমহিলা অবশ্যই বলিবেন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।

ধূমেনাগ্নিতে বহ্নির্গথাদর্শো মলেন চ ।

মথোন্মেনারতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন ধূমে বহিঃ আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে ।

“জ্ঞান” শব্দটী মূলে নাই,—তৎপরিবর্তে “ইদম্” আছে । কিন্তু পরশ্লোকে “জ্ঞান” শব্দই আবৃতের বিশেষ্য ; এজন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল ।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে ।

“সদৃশং চেষ্টতে স্বভাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি”

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে ? তাহাই বুঝাইবার জন্ত বলিতেছেন যে জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ষণ্য হয় ।

উপমা তিনটী অতি চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্বে বলা আবশ্যিক । “মল” শব্দে শঙ্করাচার্য্য “মল” অর্থাৎ “মলাই” বুঝিয়াছেন । কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, “নলেন” কিনা “আগন্তুকেন” । এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে “মল” শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে ।

উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক । যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক । বহির স্বাভাবিক আবরণ ধূম ; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণস্থ নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক । ইহা পূর্বেই কথিত আছে । উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্ম ; বহিঃ প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ;—তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক । প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ । ফুৎকারাদির দ্বারা

ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিশ্বাবরণ, এবং প্রেমবের দ্বারা উজ্জ্বলাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায় । ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব ।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোস্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কোস্তেয় ! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে ।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু । ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে দুঃখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিশ্চয়োজনীয় তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্ত নিত্যশত্রু* । ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই ; এবং ইহা সম্ভাপহেতু, এই জন্ত অগ্নিতুল্য । ৩৯ ।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্বাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে । জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে । ৪০ ।

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে । আত্মা হইতে পৃথক্ । আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না । আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে ।

* ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন ।

তস্মাদ্বিমিত্ত্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপপুনাং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর । ৪১ ।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে । তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে ।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি ? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্ম-বিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, অথবা “জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাস জাত ।” শঙ্করাচার্য্য বলেন, “জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যালঙ্ক আত্মাদির অবরোধ । আর তাহার বিশেষ প্রকার অমুভবই বিজ্ঞান । পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন । আমি বুঝি, যে এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে কাম, সর্বপ্রকার জ্ঞান, ও আত্মার উন্নতিব বিনাশক ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাছুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈর্যঃ পরতস্ত সং ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ । ৪২ ।

এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত

করিয়া, হে.মহাবাহো! তুমি কামরূপ ছরাসদ * শত্রুকে জয় কর। ৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে হুবোধ্য।

বলা হইতেছে, যে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে! তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?।

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিম্বে? ভাষ্যকারেরা বলেন ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থূলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে “আহঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা

* ছরাসদ শব্দে ছর্কিজের, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন । কে এরূপ বলিয়াছে ? সাংখ্য দর্শন স্বরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি ।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে । পর্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ ।

১। প্রকৃতি ।

২। মহৎ ।

৩। অহঙ্কার ।

৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় ।

২০-২৪। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ।

২৫। পুরুষ ।

এই পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় ; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত । পুরুষ পরমাত্মা ।

এই পর্যায়ানুসারে সূক্ষ্মভূত (স্বপ্নাদি, স্মরণ্য পাক্‌ভৌতিক দেহাদি) হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ । এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ ; কিন্তু সাংখ্য মতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অশ্রুগুলি বহিরিন্দ্রিয় । দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে বিজ্ঞানভিক্স সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন । অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়ন-কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্য মত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে । তাহারই সম্ভাসমানে কপিল প্রচারিত সাংখ্য ।

গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্থূলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চ-তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবেঃ* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন, যে ভগবান্ বলিতেছেন যে এই আট প্রকার আমার প্রকৃত। অতএব কপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর।

যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটা অর্থ আছে। নিশ্চয়ান্বিতী অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। † এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ

* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫। ৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতাত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিঃ সাত্ত্বমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎসংস্যাঃ শ্রেতনা ধৃতিঃ ।

• এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ইহাতে কপিল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল সাংখ্য নহে। বরং কপিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার—২৮

বুঝিবার জ্ঞান এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অল্প সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিবা। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কানকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয় জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথায়ও কখনও কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না।*

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বে ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে কৰ্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

* সভ্যসমাজে মানুষের একটী ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায়, যে “ইন্দ্রিয়-দোষ” বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসা হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রত্যুত্তর করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন, যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বা তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পান্যাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্মতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্মান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্ণাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন ।

এই অব্যয়যোগ আমি সূর্য্যাকে বলিয়াছিলাম । সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্ণাকুকে বলিয়াছিলেন । ১ ।

মৎস্তের অনেক সদগুণ আছে ; কিন্তু মৎস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক । অতএব মৎস্ত মাংসের অন্ন ভোজনই ভাল । মৎস্ত মাংসের এই দোষ ভুলই ব্রহ্মচারীর পক্ষে তিন্মুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে । মৎস্ত হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ । আলস্য ইন্দ্রিয়দোষের একটী অতিশয় গুরুতর কারণ । আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্ত চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়স্থচিন্তাই বলবতী হয় । অন্ত কর্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয় । যাঁহার বিষয়কর্ম আছে, তিনি বিষয়কর্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন । তাহাতে দ্বিবিধ শুভফল ফলিবে ;—ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্মেরও উন্নতি ঘটিবে । তবে একরূপ বিষয়কর্ম চিন্তার দোষ এই ঘটে, যে লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে । সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয় । অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসরকালে স্মৃতিহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন । যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অনমুরাগী তাঁহারা আপনার কার্য শেষ করিয়া পরের কার্য করিবেন । পরিবারস্বর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার

এই যোগের ফল অব্যয়, এক্ষুণ্ণ ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে ।
ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নম্যঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত
হইয়াছিলেন । হে পরস্তপ ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ
নষ্ট হইয়াছে । ২ ।

(টীকা অনাবশ্যক ।)

স এবায়ং ময়া তেহু যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্ত্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

তত্ত্বাবধান, আপনার আয়বায়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাগিগণের স্বর্থস্বচ্ছন্দ্রের
তত্ত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন । ইহাতে
যাঁহাদের মন না যায়, তাঁহারা কোনও গুরুতর পরকার্য্যে নিযুক্ত হইতে
পারেন । অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে
ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ । যাঁহারা ইঞ্জিয়পরশন,
অঙ্গলীভাষী, অঙ্গলী আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ
করিবে । ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা, ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত
হইতে পারেন । সত্য সমাজে বাসের একটা প্রধান অঙ্গল এই কুসংসর্গ ।

(৫) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য
প্রণয় । এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই ।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা
লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল ।

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

(টীকা অনাবশ্যক।)

অর্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং হ্রমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

আপনার জন্ম পরে, শূর্য্যের জন্ম পূর্বে; আপনি যে ইহা পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ? ৪।

(টীকা অনাবশ্যক।)

শ্রীভগবানুবাচ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তাং হং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরন্তপ! তুমি জ্ঞান না।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্ত উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, 'যে মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব

আঁটিরাপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান । তৃতীয়তঃ দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে ; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্নপ্রকারও আছে । ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটী ; আবার এ কথাও আছে যে অবতার অসংখ্যের । শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটী কি দশটী কি বাইশটীর কথা বলিতেছেন না । “বহু” অবতারের কথা বলিতেছেন । ভাগবতের “অসংখ্যের” এবং এই “বহু” শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই ।

অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

আমি অজ ; আমি অব্যয়ান্না ; সর্বভূতের ঈশ্বর ; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি ।

অজ—জন্মরহিত

অব্যয়ান্না—যাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর)

ঈশ্বর—কৰ্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত (শ্রীধর)

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব জগৎ যাহার বশীভূত ।

এতদ্ব্যতীত নূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য” লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামী “স্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন । শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে ।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে

পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জানে মোক্ষ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কৰ্ম্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এজন্ত কৰ্ম্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাঁহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপজন্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাঁহার বশে আছে, যদ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে বাস্তবদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে।

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন, যে আমি আপনার শুদ্ধস্বভাবাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিগুণ উজ্জ্বল স্বত্বমুক্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত।

“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, যে তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের চীকার আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।—

ভূমিপোহনলোবাসুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার
ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি । ৪ । ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

অপরেয়মিতত্ত্বজ্ঞাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মৈদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি ; আমার পরা বা
উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জ্ঞান । ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ
ধারণ করিয়া আছেন । ৫ ।

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ
করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়ী । আপনার
জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে
বলীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন ।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার
বিচার নিম্নপ্রয়োজন ; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্,—
পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দেশ
করা হয় । ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না সে
স্বতন্ত্র কথা । তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য করি-
য়াছি—পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । আর শরীর ধারণ পূর্বক
ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্
নিজেই পর শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন ।

* কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ডে ।

যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্মসংস্থাপনার্থায় সন্ত্বামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি । ৮ ।

সাধুগণের পরিভ্রাণহেতু দুষ্কৃতকারীদের বিনাশার্থ এবং ধর্ম সংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি* । ৯ ।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ভ্যক্তৃ দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জুন ! আমার জন্ম কৰ্ম দিব্য । ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয় । ৯ ।

দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত”, “ঐশ্বর্য”, বা “অলৌকিক” ।

ভগবানের মানবিক জন্ম কৰ্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন ? আমি কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্ত ভগবানের মানবদেহ ধারণ । অতঃ উদ্দেশ্য সম্ভবে না । আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কৰ্মী । অতএব কৰ্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কৰ্মীর কৰ্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যিক । তদ্ব্যতীত কৰ্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ । যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কৰ্মযোগ কখনকালে এই অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের

* এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি । পুনরুক্তি অনাবশ্যক ।

কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকল্পিত বুদ্ধিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুদ্ধিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। বাহ্যকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এই-রূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সন্ধান নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কৰ্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। বাহ্যকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্ৰোধা মন্যয়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্ৰোধ, মন্যয়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্তার দ্বারা পূত, অনেকে মন্তাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-অমুরাগ। মন্যয়-ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বর-ভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ; শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মন্তাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাব্যকারেরা বলেন, যে এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈশ্বর জ্ঞানতাপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে যাহারা আদর্শ-কর্ম্মের কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কামকর্ম্ম হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্ম্মের কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তুথৈব ভজাম্যহম্।

মম বহ্নানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববিশঃ ॥ ১১ ॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব প্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়।

অগ্রে প্রথম চরণ ঘূঝা বাড়িক। অর্জুন বলিতে পারেন, “প্রভো! আসল কথাটা কি, তাত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু পাইব না কি?”

সেগুলো কি পণ্ডশ্রম ?” ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন । সকলেই একই প্রকার চিন্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না । যে যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেই-রূপ ফল দান করি । যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি । যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমার পায় । কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমার পায় ।

তার পর দ্বিতীয় চরণ । “মানুষ্য সৰ্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হয়,” এ কথাটির অর্থ সহসা এই বোধ হয়, যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ্য সৰ্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে । এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের “Idiom” ঠিক আমাদের “Idiom” সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না । এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মানুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে ।” “মানুষ্য যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে, কেন না এক ভিন্ন দেবতা নাই । আমিই সৰ্ব্বদেব—অন্ত দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই । এমন কি, যদি মানুষ্য দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা । কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই—ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই ।” ইহা নিরুপস্ট ও হুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি ।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে । কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন । কেহ একমাত্র

জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন ; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে । এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র । যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপাশ্বে পুষ্পচন্দন-সিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায় ; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক । কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ । যে হিমালয় পর্বতকে বন্যক পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ । ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বর স্বরূপ অবগত নহেন—শিলা-খণ্ডের উপাসকও নহে । তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে ? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য । স্থূল কথা, উপাসনা আমাদের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্ত—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্ত নহে । যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিতে পারি না । তবে ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক—কেন না কর্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিগুহ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে । যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্মিক বলিয়া প্রতীষ্ঠালাভের উপায়

স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী । আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য । যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্ত হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় বটীতলায় নাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয় ।

এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না ;—হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায় । এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—একমাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম্ম । ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম । হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই ।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২ ॥

ইহলোকে যাহারা কৰ্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে । এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কৰ্ম্মসিদ্ধি হয় । ১২ ।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কৰ্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয় । সে ফল সামান্য । নিষ্কাম কৰ্ম্মের ফল অতি মহৎ । তবে

মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব, যে যে সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টিং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করি-
রাছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি)কর্ত্তা হইলেও আমাকে
অকর্ত্তা ও বিকার-রহিত জানিও । ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ
হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শূদ্র চরণ
হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ চাতুৰ্বৰ্ণ্যং সৃষ্টি হইয়াছে,
এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ
সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার
আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি
বিখ্যাত পুরুষসূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত
কহে। উহার প্রথম ঋক্ “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ” ইত্যাদি
ব্রাহ্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে বৈদিক
কালে জাতিভেদ ছিল না,—তাহারা বলেন যে এই সূক্ত আধু-
নিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিক সূক্ত
লবই অতি প্রাচীন ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

আমার বলিবার কথা, ঐ শ্রুতে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না, যে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

“ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজত্ব কৃতঃ ।

উরু তদন্ত বৈশ্বঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥”

শূদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন। * বৈশ্ব সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্ব ।

* ডাক্তার হোগ্‌ এই ঋক্‌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“Now, according to this passage, which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and *caste in general*, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanical caste, that is to say, was transformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক শ্রুতে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points out that the Brahmins are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made a Kshattriya (warrior), that means, then, that the Kshattriyas have to carry arms to defend the empire. That the thighs of the Purusha were transformed into the Vaisya, that, as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাণ্ডয়া যায় যে প্রজাপতির 'মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুৰ্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্রহ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং
স্বরিতি বিশম্।” শূদ্রের কথা নাই। *

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

provide food for the others.” (এটুকু বড় কষ্ট করনা,—উরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—মহাভারতের শান্তিপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

“ব্রহ্ম বক্ত্রং ভূজো ক্ষত্রং কৃৎস্নমূদরং বিশঃ” তার পর) “The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm support.” *Dr. Haug on the origin of Brahmanism. p. 4.*

Dr. Muir ও বলেন, “It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha's feet ; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite clear which (i. e.) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12. (উদ্ধৃত শ্লোক) to declare that the three castes where the three members or conversely that the three members were, or became the three castes.”—*Sanskrit Texts Vol. II, p. 16, 2nd Edition.*

* ২।১।৪।১১ ইত্যাদি।

“ঋগ্ভো জাতং বৈশ্বং বর্ণমাছঃ। যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়স্তাহর্যো-
নিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রমুতিঃ।” * অর্থাৎ সামবেদ
হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে
বৈশ্বের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই।

উদাহরণ স্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন
আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের
বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ভূত্যা উপপত্তি
সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন,
তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে
পারে। তিনি বলেন, যে আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণ-
বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্মের বিভাগানুসারে
করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান
ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম শমদমাদি; সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়,
তাহাদিগের কর্ম শৌর্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্ব, তাহাদিগের
কর্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম অগ্নি
তিন বর্ণের সেবা। এইরূপ গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট
করিয়াছি, ইহাই ভগদতিপ্রায়।

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য,
রজোগুণাধিক্য, বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয় ?

যিনি বলিবেন, যে আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার
সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে

মন্তব্যের বংশাঙ্কসারে নহে, গুণাঙ্কসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সব গুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে, এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্ভাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্মতত্ত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা,—

কাস্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতান্ধানং জিতেন্দ্রিয়ম্।

তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেযাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ স্তুতীন্।

উপবাসরতান্ দাস্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিহুঃ ॥

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।

চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

গৌতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতান্ধা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, স্তুতি, উপবাসরত, দাস্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয়সমল্যাপর্কোধ্যায়ে ১১৫

অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, “পাতিতাজনক কৃত্রিয়াক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম, ও ধর্মে সতত অক্লান্ত তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বে অঙ্গগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান ক্ষমা, আনুশংগ, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তদ্ব্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক বিজ্ঞাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, একরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।”

কিন্তু হইতেছিল, নিষ্কাম ও সাকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা,—চাতুর্কর্ণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবদিগর যজ্ঞনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে একরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহা-দিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই চাতুর্কর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈ কি? কিন্তু একরূপ কর্ম করিয়াও তিনি অকর্তা। কেন না তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাহার সুখ দুঃখ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের

অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম নিষ্কাম। তিনি নিষ্কাম-কর্মী। মনুষ্যও সেই জন্ত নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকর্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিয়মে (Law) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম। যাহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ। যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কর্ম্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভিন্ স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্ম্মে ফল-স্পৃহা নাই। এইরূপ আমায় যে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না।

ঈশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্ব শ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাহ্বা কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্বেবরপি মুমুকুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাদ্ধ্বং পূৰ্বেবঃ পূৰ্ব্বতমং কৃতং ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূৰ্ব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কৰ্ম্ম করিয়া-
ছিলেন, তুমি পূৰ্ব্বগামীদিগের পূৰ্ব্বকাল-কৃত কৰ্ম্ম সকল কর । ১৫ ।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে যাহারা মোক্ষকাম, তাহারা আপনাকে
অকর্তা জানিয়া—কৰ্ম্মের ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়া কৰ্ম্ম
করিতেন । তুমিও সেইরূপ কৰ্ম্ম কর ।

কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মৈতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তন্তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাহ্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্ম কি, অকৰ্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না ।
অতএব কৰ্ম্ম কি তাহা তোমাকে বলিতেছি । তাহা জানিলে,
অশুভ হইতে মুক্ত হইবে । ১৬ ।

অকৰ্ম্ম অর্থে এখানে মল্লকৰ্ম্ম নহে—অকৰ্ম্ম অর্থে কৰ্ম্মশূন্যতা ।

কৰ্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণোগতিঃ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকৰ্ম্ম কি তাহা বুঝিতে
হইবে, এবং অকৰ্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে । কৰ্ম্মের গতি
হুজের । ১৭ ।

কৰ্ম্ম,—অর্থে বিহিত কৰ্ম্ম, যাহা ষথার্থ কৰ্ম্ম ।

বিকৰ্ম্ম—অবিহিত কৰ্ম্ম ।

অকৰ্ম্ম—কৰ্ম্মত্যাগ, কৰ্ম্মশূন্যতা ।

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যোষু সংযুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যে কৰ্ম্মেতেও কৰ্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকৰ্ম্মেও কৰ্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্ । সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সৰ্ব্বকৰ্ম্মকারী । ১৮ ।

ভগবদারাদনা কৰ্ম্ম ; কিন্তু তাহাতে কৰ্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কৰ্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না । আর যে কৰ্ম্ম বিহিত, তাহা করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিহ মুক্তির রোধক ; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকৰ্ম্মকেই কৰ্ম্ম বিবেচনা করিবে । ঈশ্বরের চাঁকার মৰ্ম্মার্থ এই । ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায়, যে ভগবদারাদনাই কর্তব্য । অত্যাশ্রয় অনুষ্ঠান মুক্তির বিষয় ।

শঙ্করাচার্য্য অত্যাশ্রয় বুঝাইয়াছেন । তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটা দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল কথা এই—আত্মা ক্রিয়ানির্লিপ্ত ; কৰ্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কৰ্ম্মারোপ হইয়া থাকে । যিনি ইহা জানেন তিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দেখেন । আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকৰ্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কৰ্ম্ম দেখেন ।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায় । কামসংকল্প-বিবর্জিত, ফলকামনামুক্ত যে কৰ্ম্ম, সে অকৰ্ম্ম—কৰ্ম্মশূন্যতা । আর যিনি অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মে বিরত, তাহার কর্তব্য-বিরতির ফলভাগিহ আছেই

আছে—অতএব এখানে কর্মশূন্যতাও কর্ম। কেন না ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যশ্চ সর্বৈব সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমালঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত, এবং যাহার কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

“কামসঙ্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গোরব কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ এই;—“কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ,” “কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্বর্জিতাঃ”। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কামাতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জিতাঃ। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্লোহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবর্জিত হইলে কর্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা করে না, সে কর্ম করিবে কেন? এজন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুদৈব চেষ্টামাত্রা অকুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমারম্ভ সকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে, কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, যে তাহা হইলেও কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও “লোকশিক্ষার্থং” ও “জীবনবাত্তার্থং” কথা দুইটা রাখিয়াছেন, কিন্তু কামসঙ্কল্পবর্জিত” পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূত্রতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্মে তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূত্রতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি? ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা বাতীত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিকাম শব্দের অর্থ নাই—এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য আছে, যাহা মনুষ্যের অমুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহারও পক্ষে অমুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অমুষ্ঠেয়। যে শূল রোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোদ্দুপ, বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্ত-প্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আনাদের অমুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে

উদ্ধার কালে মনে হইতে পারে, “আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।” এখানে ফল কামনা নাই, কিন্তু কৰ্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে নিষ্কাম কৰ্ম্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই বাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কামশব্দ গীতায়, বা অন্তত্ব এমন অর্থে ব্যবহার হয় না, যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি অন্তষ্ঠের কৰ্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কর্তব্য।

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী অপবৰ্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে, ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। বাহ্য, ধৰ্ম্ম, অর্থ, অর্থাৎ ঐহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত তাহাই কাম। এই জন্ত কাম্য কৰ্ম্মের দ্বারা, স্বর্গাদি লাভ সাধনকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্য কৰ্ম্মজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কামশব্দ মহাভারতের অন্তত্ব বিশেষ করিয়া বুঝান আছে।

ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ পঞ্চানামনসো হৃদয়স্ত চ।

বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরূপজায়তে।

স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কৰ্ম্মণাং ফলমুত্তমম্ ॥

পাচটী ইন্দ্রিয় মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার বিবেচনার, তাহাই কাম । তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল ।

অতএব কাম অর্থে আশ্বস্তুথ ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর । যদি স্বদেশ-হিতৈষী কেবলমাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহারি কর্ম্ম নিষ্ফল । আর যদি আপনার যশ, মান সম্মান, উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্ম ।

তত্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥২০॥

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না । ২০ ।

নিরাশীৰ্যতচিন্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্মাপ্নোতি কিলিুষম্ ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসম্বন্ধে দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্যপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যিনি কামনা ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাহার মন ও আত্মা বিমুক্ত, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মাক্ষুণ্ণ করিয়া ও পাপভাগী হন না ; যিনি যদৃচ্ছালাভে সম্বৃত্ত ; দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈর-

বিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না । ২১ । ২২ ।

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং বাহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যথার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৰ্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যায় । ২৩ ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব স্তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অৰ্পণ- (অৰ্হাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, হবনীয় যুতাди ব্রহ্ম, অগ্নি, ব্রহ্ম, ও যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এই প্রকার কৰ্ম্ম স্বরূপ ব্রহ্মে বাহার সমাধি হইয়াছে তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । ২৪ ।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পযু্যপাসতে ।

ব্রহ্মাঘ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

কতকগুলি যোগী সম্যকরূপে দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন ; কোন কোন যোগী পূৰ্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকল আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন । ২৫

শ্রোত্রাদীনৌদ্দ্রিয়ান্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আ

কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন । ২৬ ।

সর্ববাসীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা উদ্দীপিত আত্ম-ধ্যানরূপ যোগা-
গ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম, কর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম
সকল আহুতি প্রদান করেন । ২৭ ।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দৃঢ়ব্রত যতিগণ, দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদ-
পাঠ ও বেদজ্ঞান এই কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ২৮ ।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপান বৃত্তিকে আহুতি প্রদান
করিয়া পুরক, অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া
রেচক এবং প্রাণ অপানের গতি রোধ করিয়া কুন্তকরূপ প্রাণা-
য়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয়
সমুদয়কে হোম করিয়া থাকেন । ২৯ ।

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টানৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন, এবং যজ্ঞ শেষ
রূপ অমৃত ভোজন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন । ৩০ ।

নাযং লোকেহিস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ।

হে কুরুসত্তম ! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে
থাকুক, ইহলোকও নাই । ৩১ ।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এইরূপ ভূরি ভূরি যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত আছে, তৎসমুদয়ই
কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, তুমি এইরূপ অবগত হইয়া (জ্ঞাননিষ্ঠ)
হইলে মুক্তি লাভ করিবে । ৩২ ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যাময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।

সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

হে পরস্তপ ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত
আছে ; অতএব হে পার্থ ! দ্রব্যাময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই
শ্রেষ্ঠ । ৩৩ ।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী
জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন । ৩৪ ।

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্নশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তান্নন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অর্তিভূত হইবে না ; তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। ৩৫।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বৈবভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।

সর্বিং জ্ঞানপ্রাবনৈব বুজিনং সন্তুরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যত্বেপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬।

যথৈধাংসি সনিক্কাহগ্নিভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকৰ্ম্মাগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

যেমন প্রজ্বলিত হতাশন কাষ্ঠ সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেই রূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মভূত করিয়া থাকে। ৩৭।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎ স্বরং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনোত্তমি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

উহ গোকে জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্শু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। ৩৮।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি গুরুপদে শ্রদ্ধাবান্, গুরুগুণশ্রদ্ধাপরায়ণ ও জিতে-
ন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। ৩৯।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়ান্বিনঃ ॥ ৪০ ॥

কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ;
সংশয়াত্মার ইহলোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও
নাই । ৪০ ।

যোগসংযত্কর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ান্ ।

আত্মবল্লভং ন কৰ্ম্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

হে ধনঞ্জয় ! যিনি যোগ দ্বারা কৰ্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও
জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন ; কৰ্ম্ম সকল সেই অপ্রমত্ত
ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না । ৪১ ।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমতিষ্ঠেতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত অজ্ঞান-
সম্ভূত সংশয় ছেদন করিয়া কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর । হে ভারত !
উঠ । ৪২ ।

ইতি জ্ঞানবিভাগযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগকঃ শংসসি ।

যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ক্রহি স্তুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে কৃষ্ণ ! তুমি সন্ন্যাস (তাগ) ও কৰ্ম্ম-
যোগ উভয়ের কথাই কহিতেছে ; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা
শ্রেয়স্কর তাহা অবধারিত করিয়া বল । ১ ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির
কারণ ; কিন্তু তন্মধ্যে কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । ২ ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্তুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই (কৰ্ম্মানুষ্ঠান
কালেও) নিত্য সন্ন্যাসী ; কারণ তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই অনা-
য়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন । ৩ ।

সাত্বিক্যযোগৌ পৃথগ্খালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাহ্বিতঃ সম্যগুভয়োৰ্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

মুখেরাই সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে, কিন্তু পণ্ডিতেরা একরূপ কহেন না ; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগ এই উভয়ের মধ্যে একটীর সমাক্ষ অহুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হন । ৪ ।

যং সাষ্টাঙ্গ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গমাতে ।

একং সাষ্টাঙ্গ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম-যোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন ; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী । ৫ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো ! কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস, দুঃখ প্রাপ্তির কারণ, কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন । ৬ ।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতান্নভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন, যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়-গণ বশীভূত, যাহার আত্মা সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা নির্বাহার্থ কর্ম অহুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না । ৭ ।

নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্যেত তদ্বিৎ ।

পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্বন্নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিশ্বজন্ গৃহুন্নু স্মিষস্মিমিষন্নপি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

পরনার্থদর্শী কর্মযোগী, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন, (ভোজন), গমন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন আমি কিছুই করিতেছি না; ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । ৮-৯ ।

ব্রহ্মণ্যাদ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥

যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রের জলের ছায়া তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না । ১০ ।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর মন বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি বর্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন । ১১ ।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিগাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কাম্যকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন; কিন্তু কাম্যনিষ্ঠাবিশেষ ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মে বশতঃ ফলপ্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয় । ১২ ।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্তান্তে সুখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া
নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং কর্মে
প্রবৃত্ত হন না ও অন্তকেও প্রবৃত্ত করেন না। ১৩।

ন কর্তৃহং ন কর্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বকর্তা ঈশ্বর জীবলোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম সকল সৃষ্টি করেন
না এবং কাহাকেও কর্মফলভাগী করেন না ; স্বভাবই তৎ সমু-
দয়ের প্রবর্তক। ১৪।

নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্তরুতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; জ্ঞান অজ্ঞানে
আবৃত হয় বলিয়া জীব সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

ঐহারা জ্ঞানদ্বারা আত্মার অজ্ঞানত্ব বিনাশিত করিয়াছেন,
কাহাদিগের অজ্ঞানত্ব আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৬।

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তম্মিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরেই বাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই বাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই বাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেই বাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন । ৭ ।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তি নি ।

শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন । ১৮ ।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

বাঁহাদিগের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনানন্তাতেই সংসার জয় করেন ; নির্দোষ ব্রহ্ম সৰ্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী ব্যক্তিরা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ১৯ ।

ন প্রহযেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসমুদ্যো ব্রহ্মদিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষমুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না ; কেন না, তিনি উৎসব হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ২০ ।

বাহুস্পর্শমদ্রুমস্তায়া বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শাস্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন । ২১ ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর ; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না । ২২ ।

শক্লোত্তীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী । ২৩ ।

যোহন্তঃসুখোহস্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার সুখদৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন । ২৪ ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

২৫মো পাণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষলাভ করেন । ২৫ ।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষলাভ করেন । ২৬ ।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সং ॥ ২৮ ॥

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে (রূপরসাদি) বাহ্য দিগ্ধ সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ক্রযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান-বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া, ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর-পরাহত করিয়া-ছেন, তিনিই জীবমুক্ত । ২৭ ২৮ ।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

মানবগণ, আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুহৃৎ জানিয়া শাস্তি লাভ করেন । ২৯ ।

ইতি কৰ্ম্মসন্ন্যাসযোগোনাং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্যাং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নটাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন । হে অৰ্জুন ! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া
কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; কিন্তু যিনি
অগ্নিসাধা ইষ্ট (যজ্ঞকৰ্ম্মাদি) ও পূৰ্ত্ত (পুষ্করিণী খননাদি প্রভৃতি)
কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন । ১ ।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হ্যসংযতস্তস্কলো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

হে পাণ্ডব ! পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দেশ করি-
য়াছেন, তাহাই যোগ ; অতএব কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে
যোগী হইতে পারে না । ২ ।

আরুরুক্ষোমুর্নেৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগরূঢ়স্ত তসৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কৰ্ম্মই
তঁাহার সহায় ; আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন,
কৰ্ম্মত্যাগই তঁাহার সহায় । ৩ ।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বশ্লবজ্জতে ।

সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগরূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যিনি সর্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাবন ক্ష্মে আসক্ত না হন, তিনি তখন যোগাক্ষত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন । ৪ ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আত্মা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু । ৫ ।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুত্বং বর্জেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু ; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুর ছায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয় । ৬ ।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেযু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ও মান অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে । ৭ ।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোকীশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

যাহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি

নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোভ, প্রস্তুত ও কাঞ্চন মন
জ্ঞান করেন, সেই যোগী যোগাক্রম বলিয়া উল্লিখিত হন । ৮ ।

সুহৃদ্বিত্রাযুদাসীনমধ্যস্থদেব্যবন্ধুযু ।

সাধুস্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যিনি সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দেব্য, বন্ধু, সাধু
ও অসাধু সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৯ ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা
ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া
চিত্তকে সমাধান করিবেন । ১০ ।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্যাসনে যুজ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্র-
মনে পবিত্রস্থানে ক্রমাগত কুশ, অজিন ও বস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত অনতি
উচ্চ অনতি নীচ স্থিরতর আসন সংস্থাপন করত, অহাতে উপ-
বেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে । ১১। ২ ।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিতং ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীৰ্ব্রক্ষচাৰিত্ৰতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অত্যাশ্রয়িত হইতে আকর্ষণপূর্বক স্থায় নাদিকার অপ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে ; যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ব্রক্ষচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণ পূর্বক অবস্থান করিবে । ১৩।১৪ ।

যুগ্মেন্বেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাহণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমার সাক্ষ্যরূপ মোক্ষ প্রধান শান্তিলাভ করে । ১৫ ।

নাত্যশ্নতস্ত্র যোগোহস্তি ন চৈকাস্তমনশ্নতঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলস্ত্র জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না । ১৬ ।

যুক্তাহারবিহারস্ত্র যুক্তচেষ্টস্ত্র কৰ্ম্মস্ত্র ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত্র যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যাহার আহার, বিহার, কৰ্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন । ১৭ ।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যখন বশীভূত চিত্ত সৰ্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া
আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত বলিয়া উল্লিখিত
হয়। ১৮।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেজতে সোপমা শ্মৃতা।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠান কালে
নির্বীত, নিষ্কম্প দীপের ত্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। ১৯।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়,
যে অবস্থায় বিগুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া
আত্মাতেই পরিতুষ্ট হয়। ২০।

সুখমাত্যস্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তদ্বতঃ ॥ ২১ ॥

যে অবস্থায় বুদ্ধিমাাত্র-লভ্য অতীন্দ্রিয়, আত্যাস্তিক সুখ উপলব্ধি
হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত
হইতে হয় না। ২১।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যে অবস্থা লাভ করিলে অন্ত লাভকে অধিক বোধ হয় না

এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখ ও বিচালিত করিতে পারে না । ২২ ।

তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিগ্নচেতসা ॥২৩॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪॥

সেই অবস্থার নামই যোগ । তাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্বেদশূণ্য চিন্তে অভ্যাস করিবে । সংকল্প-সমুৎপন্ন কামনা সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে । ২৩ । ২৪ ।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদু দ্ব্য ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃদ্ধা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধির দ্বারা অগ্নে অগ্নে বিরতি অভ্যাস করিবে ; অথ কিছুই চিন্তা করিবে না । ২৫ ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে । সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে । ২৬ ।

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশান্তচিত্ত রজোবিহীন, নিষ্পাপ, জীবমুক্ত যোগী নিরতিশয়
সুখলাভ করেন । ২৭ ।

যুঞ্জম্বেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া
অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ জনিত সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন । ২৮ ।

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও
আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন । ২৯ ।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন
করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য
হয় না । ৩০ ।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাহিতঃ ।

সর্বথা বর্ধমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ধতে ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমাকে সর্বভূতস্থ

মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক,
আমাতেই অবস্থান করে । ৩১ ।

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখের ভায়ে সকলের
সুখ দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী । ৩২ ।

অর্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগস্তুয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্মাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

অর্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি আত্মার সমতারূপ যে
যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার
দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না । ৩৩ ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।

অস্মাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তুঙ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

মন স্বভাবত চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজ্ঞেয় ও দুর্ভেদ্য,
যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগ্রহীত করাও
সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে । ৩৪ ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন ! চঞ্চলস্বভাব মন যে হ্রস্বনিগ্রহ
তাহার সংশয় নাই ; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে
নিগৃহীত করিতে হয় । ৩৫ ।

অসংযতাত্মনা যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে হ্রস্বট,
যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি
যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ । ৩৬ ।

অর্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি (প্রথমে) শ্রদ্ধাবান্
কিন্তু পরে যত্নহীন হইয়া যোগভ্রষ্টচেতা হয়, সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত
না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ? । ৩৭ ।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্চতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

হে মহাবাহো ! সে কি যোগ ও কর্ম (মোক্ষ ও স্বর্গ)
উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্ম লাভের উপায় অনভিজ্ঞ
হইয়া ছিন্ন মেঘের স্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ? । ৩৮ ।

এতন্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হিস্তশেষতঃ ।

হৃদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেত্তা ন হু পপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর ; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না । ৩৯ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন, হে পার্থ ! যোগব্রহ্ম ব্যক্তি, কি ইহ-লোকে কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না ; (কারণ) কোন শুভকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । ৪০ ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্মুষিত্বা শাস্ত্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

যোগব্রহ্ম ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধন সম্পন্নদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে । ৪১ ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্নি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অথবা বুদ্ধিমানু যোগীদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করে ; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ । ৪২ ।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিক্তৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

যোগব্রহ্ম ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভ বিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে । ৪৩ ।

পূর্ব্বেভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্রবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

যোগব্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বেজন্মকৃত অভ্যাসই তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে, তখন সে যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করে । ৪৪ ।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঙ্খিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

নিষ্পাপযোগী অধিকতর যত্ন সহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । ৪৫ ।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অজ্জুন ! তুমি যোগী হও । ৪৬ ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনাস্তুরান্তনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, সে আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । ৪৭ ।

ইতি অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক, যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর । ১ ।

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জ্ঞান্না নেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

আমি যে অন্তর্ভব সহকৃত জ্ঞান সমাগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা বিদিত হইলে শ্রেয় বিবয়ে আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না । ২ ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেশু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তদ্বতঃ ॥ ৩ ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় । ৩ ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরঋধা ॥ ৪ ॥

আমার মায়াৰূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটপ্রকারে বিভক্ত । ৪ ।

অপরেয়মিতস্তৃণ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো ! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্ট), এতদ্ভিন্ন
আর একটি জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ চেতনাময়ী) প্রকৃতি
আছে ; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ৫ ।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ববানীতূপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

হাবরজঙ্গমাঙ্কক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ
প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, অতএব আমিই এই সমস্ত
বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্তা । ৬ ।

মন্তুঃ পরতরং নান্নং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্ববিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; ধেমন
সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত
রহিয়াছে । ৭ ।

রসোহহমপ্সু কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রগবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

হে কোন্তেয় ! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে,

সমুদয় বেদে ঔঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে অবস্থান করিতেছি । ৮ ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্তারূপে অবস্থান করিতেছি । ৯ ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ ! তুমি আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বিদিত হও, আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ । ১০ ।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

হে ভরতর্ষভ ! আমি বলবানের কাম ও রাগ রহিত বা ত্যাকাজ্জাশূন্য বল ও সর্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম । ১১ ।

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্ত্যামসাশ্চ যে ।

মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে সমস্ত সাত্বিক, রাজসিক ও তামাসিক ভাব আছে, তাহা আমি হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন ; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি । ১২ ।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

জগতীহ্ সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত
হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না । ১৩ ।

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আশুর এক মায়া আছে ;
বাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে
সমর্থ হয় । ১৪ ।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ মায়া দ্বারা বাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং বাহারা
আশুর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্মকারী, নরাধম,
মূর্থ, কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না । ১৫ ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভঃ ॥ ১৬ ॥

আর্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থ্যভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি
প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে । ১৬ ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্টতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ; আমি
জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয় । ১৭ ।

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

পূৰ্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ তিনি মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করতঃ আশ্রয় করিয়া থাকেন । ১৮ ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্নুদুল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহু জন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ । ১৯ ।

কামৈশ্চৈশ্চৈবৈবর্তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহনুদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও কামসদ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে । ২০ ।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্মৈ তত্শ্রদ্ধাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে কোন দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই অচল শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি । ২১ ।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মিন্ আরাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

তঁহার সেই শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করেন ; তৎপরে আমি হইতেই হিতকর অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ২২ ।

অস্তবন্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবসায়মেধসাম্ ।

দেবানু দেবযজো যান্তি মদন্ত্য যান্তি মামপি ॥২৩॥

কিন্তু সেই সকল অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবলব্ধ ফল সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়, দেবযাজী ব্যক্তির দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ২৩ ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রিত্য মনুষ্যন্তে মানবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুভূতম্ ॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত কিন্তু নির্কোষ মনুষ্যেরা আমার নিত্য সর্বদা অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য মীন ও কুর্মাাদি ভাবাপন্ন মনে করে । ২৪ ।

নাহং প্রকাশঃ সর্ববশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ্ঞমব্যয়ম্ ॥২৫॥

আমি যোগমায়ার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি সকলের সমক্ষে কদা প্রকাশমান হই না এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জ্ঞানহীন ও অব্যবলিয়া অবগত নয় । ২৫ ।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্ত বৈদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

হে অর্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। ২৬।

ইচ্ছাদ্বেষসমুৎথেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

হে শক্রতাপন ভারত! জন্মগ্রহণ করিলে ভূত সকল ইচ্ছা দ্বেষ সমুৎথিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে। ২৭।

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্শ্মণাম্।

তে দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাঙ্গাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর ব্রত পরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে আরাধনা করেন। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিত্বং কৃৎস্নমধ্যাত্মং কশ্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা মৃত্যু হইতে বিনিমুক্ত হইবার যত্ন করেন তাঁহারা ই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কশ্ম নাতনব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুষুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিন্ধিত হন না । ৩০ ।

ইতি জ্ঞান বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কিস্তুদ্রক্ষ্য কিমধ্যাত্মাং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্ম কাহাকে কহে ? অভিভূত ও অধিদৈবই বা কি ? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কি এবং সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে ? সংঘত চিত্ত বক্ত্রিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হন । ১ । ২ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কৰ্মসংজিততঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে অৰ্জুন ! যিনি অব্যয় ও জগতের মূল কারণ তিনিই ব্রহ্ম ; সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায় ; যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে সেই কৰ্ম । ৩ ।

অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

নম্র দেহাদি পদার্থ ভূত সকলকে অধিকার করিয়া থাকে ;
এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্যমণ্ডলবর্তী বৈরাজ
পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাহাকে অধিদেবত বলা
যায় ; আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে
অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকি। ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরনু ত্ত্ব। কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মস্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ
পূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত
হন। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তস্তাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া
দেহত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

মব্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈশ্বশ্রুসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর : আমাতে
মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে। ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নানুগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

হে পার্থ । অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্তমনে
সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয় । ৮ ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-

মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্বশ্রু ধাতারমচিন্ত্যরূপ

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম সকলের
বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ত্রায় স্বপ্রকাশ অজ্ঞানাক্রকারের
উপরি বর্ত্তমান পরমদিব্য পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন, তিনিই মৃত্যু-
কালে অবিচলিত চিন্তে ভক্তি ও যোগবলে ক্রয়ুগল মধ্যে প্রাণবায়ু
সমাবেশিত করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন । ৯ । ১০ ।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগঃ ।

• যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

বেদবেত্তারা যাহাকে অক্ষর বলিয়া থাকেন এবং বিক্ষ্যাসন্তি
শূন্য যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন ও যাহাকে বিদিত হইবার

নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্যবস্তু লাভের
উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১।

সর্ব্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূৰ্দ্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দ্বেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বার সমুদয় সংযত হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ
ও ক্রমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগ জনিত ধৈর্য্য
অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান (বাচক) “ওঁ” এই একাক্ষর
উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক
প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ১২। ১৩।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্মাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি অনন্তমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত-
চিত্ত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষরূপ পরমসিদ্ধি লাভ
করিয়া দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোঁস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জুন ! প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ১৬ ।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

দৈব সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয় । যাহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্গজ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা । ১৭ ।

অব্যক্তাদ্যুক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণ রূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায় । ১৮ ।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

সেই ভূত সমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে বিলীন হয়, এবং পুনরায় দিবসসমাগমে কন্দাদি পরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রি সমাগমে বিলীন হইয়া থাকে । ১৯ ।

পরন্তুস্মাত্তু ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্চেষ্ট ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

সেই চরাচরের কারণ রূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর, অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন, আর একটী ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না । ২০ ।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

যে অব্যক্ত ভাব অক্ষয় বলিয়া বেদে উক্ত আছে তাহাকে পরমাগতি কহে; যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তাহাই আমার পরম ধাম । ২১ ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ তক্ত্যা লভাস্বনশ্চয়া ।

যন্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূত সকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন । ২২ ।

যত্র কালে অনাবৃতিমাবৃতিং চৈব যোগিনঃ ॥

প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃতি বা আবৃতি প্রাপ্ত হন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্তন করিতেছি । ২৩ ।

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

যে স্থানে দিবস শুক্ল বর্ণ ও অগ্নির ত্বায় প্রভা সম্পন্ন এবং
ছয়মাস উত্তরায়ণ ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । ২৪ ।

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন
কর্ম্যযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্ণলাভ করিয়া নিবৃত্ত হন
ও পুনরায় সংসারে আগমন করেন । ২৫ ।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্ততে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমণ্ডয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি শাস্ত গতি আছে, তন্মধ্যে
একতরদ্বারা অনাবৃত্তি ও অত্ৰতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে । ২৬ ।

নৈতে স্মৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্ম্যং সর্বৈব কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ
বিনোহিত হন না ; অতএব তুমি সকল কালে যোগাভ্যাস
পরায়ণ হও । ২৭ ।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
 দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীক্ষ্যতাম্ ।
 অতোয়তি তৎসর্ববিদং বিদিত্বা
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্রে বেদ যজ্ঞ, তপস্শ্রা ও দানের যে ফল নির্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল কারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ২৮ ।

ইতি ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবম অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদম্ভ তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজুজ্জাহ্না মোক্ষ্যসেহ শুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে অৰ্জুন ! তুমি অহরাত্ন ;
অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে
আমি সেই গোপনীয় উপাসনা-সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্তন করি-
তেছি শ্রবণ কর । ১ ।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধৰ্ম্মাং স্নুস্বখং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, রাজগণের ও গোপনীয়, অতি
পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধৰ্ম্মানুগত ও অব্যক্ত ; ইহা অনায়াসেই
অমুষ্ঠান করা যাইতে পারে । ২ ।

অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষাঃ ধৰ্ম্মস্ত্যস্ত পরস্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবৰ্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবজ্রানি ॥ ৩ ॥

হে পরস্তপ ! যাহারা এই ধৰ্ম্মে বিশ্বাস না করে তাহারা
আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-পরিকৌণ সংসার-পথে নিয়ত
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । ৩ ।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্ত্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

হে অর্জুন ! আমি অব্যাক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে ভূত সকল অবস্থান করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি । ৪ ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভ্রম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না, আমার এই ঐশিকী অষ্টটনষ্টনাটাতুরী নিরীক্ষণ কর ; আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে ; কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না । ৫ ।

যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬ ॥

যেমন সমীরণ সর্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে । তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে । ৬ ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ।

কলক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিস্ফজামাহম্ ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয় ! কলক্ষয়কালে ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিক মায়ায় লীন হয় এবং কলপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি । ৭ ।

প্রকৃতিঃ স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কৰ্ম্মামুসারে
প্রলয়কালবিলীন কৰ্ম্মাদিপরবশ ভূত সমুদয় বারংবার সৃষ্টি
করিতেছি । ৮ ।

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তস্তেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কৰ্ম্মের আরম্ভ
নহি, আমি সকল কৰ্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ভ্রায় নির-
ন্তর অবস্থান করিয়া থাকি । ৯ ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवৰ্ত্ততে ॥ ১০ ॥

মায়া আমার অধিষ্ঠান মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব
সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ
পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে । ১০ ।

অবজ্ঞানন্তি মাং নৃতা মানুষাঃ তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমানুরৌঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি মানুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তির। আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে । বিফল আশাসম্পন্ন, বিফলকর্ম-পরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন ব্যক্তির। রাক্ষসী, আসুরী, ও মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে । ১১ । ১২ ।

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ।

কিন্তু হে পার্থ ! মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্তমনে আরাধনা করেন । ১৩ ।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতস্তৃণু দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তৃণু মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নামকীর্তন এবং যত্ববান্ নিয়মী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন । ১৪ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তো যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ভেদেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরূপাদি রূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন । ১৫ ।

অহং ক্লেতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্রোহিহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬ ॥

আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম । ১৬ ।

পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যাং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ মাতা ও বিধাতা ।

আমি পবিত্র, জ্ঞেয় বস্তু, ঔকার, ঋক্ সাম যজু । ১৭ ।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সূহৃৎ,

প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ । ১৮ ।

তপাম্যাহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

আমি উত্তাপ প্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি ;

আমিই অমৃত, মৃত্যু ও সৎ, অসৎ । একারণ লোকে আমাকে
নানারূপে উপাসনা করিয়া থাকে । ১৯ ।

ত্রেবিছা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিচ্ছ। স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাশ্চ সুরেন্দ্রলোক—

মশ্নস্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

হে অৰ্জুন ! ত্রিবেদ-বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপার্বী.
বিগতপাপ মহাঅগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সংকার করিয়া সুরলোক
লাভের অভিলাষ করেন ; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত
হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন । ২০ ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়োদশমনুপ্রপন্ন
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন ;
এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী
হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন । ২১ ।

অনন্যাস্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযু্যপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিবুদ্ধানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

যাহারা অনন্তমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি
সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া
থাকি । ২২ ।

যেহপ্যনুদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াধ্বিতাঃ ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয় ! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্ত দেবতার
আরাধনা করে তাহারা অবিধিপূৰ্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া
থাকে । ২৩ ।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তৎস্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে । ২৪ ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ২৫ ॥

দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তির দেবগণকে, পিতৃব্রত-নিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃগণকে ও ভূতসেবকেরা ভূত সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয় । ২৫ ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রবতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যিনি ভক্তি সহকারে আমাকে ফল পত্র পুষ্প ও তোয় প্রদান করেন, আমি সেই প্রবতাত্মা ব্যক্তির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি । ২৬ ।

যৎ ক্ষরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপশ্চসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষু মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

হে অর্জুন ! যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে বস্তু দান ও যে তপঃসাধন করিয়া থাক তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও । ২৭ ।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

তাহা হইলে কৰ্মজ্ঞানিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে
এবং কৰ্মপার্পণ রূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে । ২৮ ।

সমোহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহম্ ॥ ২৯ ॥

আমি সকল ভূতে একরূপ ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই ;
যাহারা ভক্তিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতে
অবস্থান করিয়া থাকে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান
করিয়া থাকি । ২৯ ।

অপি চেৎ সূদুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

যদি দূরাচার ব্যক্তিও অনন্তননে আমার উপাসনা করে, তবে
সেই সাধু ; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর । ৩০ ।

ক্ষিপং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্চছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

সে অবিলম্বে ধৰ্ম্মপরাগ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে ;
হে কৌন্তেয় ! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট
হয় না । ৩১ ।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্র্যঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ ! যাহারা নিকৃষ্ট-কুলজাত বা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত শূদ্র ও যাহারা স্ত্রীলোক, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যাৎকষ্ট গতি লাভ করিতে পারে । ৩২ ।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমশুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ (যে পরম-গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ?) তুমি এই অনিত্য অশুখকর (মর্ত্য) লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার আরাধনা কর । ৩৩ ।

মম্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুতৈর্ভুবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

আমাতে মন সমর্পণ পূর্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সঙ্গদা আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর । তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে । ৩৪ ।

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

দশম অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যত্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে মহাবাহো ! তুমি আমার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিত বাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি; তাহা শ্রবণ কর । ১ ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগণঞ্চ সর্ববিশং ॥ ২ ॥

মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভব অবগত নন (যেহেতু) আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি । ২ ।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তোষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সর্বলোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন তিনি জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন । ৩ ।

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়শ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দয়, শম, স্তুতি, হঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে । ৪ । ৫ ।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বারো মনবস্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

পূর্বতন সনক সনন্দাদি চারিজন ও ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং স্বায়ংভূবাদি চতুর্দশ মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন । ৬ ।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

সোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

যিনি আমার এই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই । ৭ ।

অহংসর্ব্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।

ইতি মন্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চনা করেন । ৮ ।

মচ্ছিত্রা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

তঁাহারা আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত
হন এবং আমার নাম কীর্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরম
শান্তি লাভ করিয়া থাকেন । ৯ ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ ॥

আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসকদিগকে বুদ্ধি প্রদান
করি, তঁাহারা তদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ১০ ।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

আমি অহুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তঁাহাদিগের বুদ্ধি-
বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার
নিবারণ করিয়া থাকি । ১১ ।

অর্জুন উবাচ ।

পরঃ ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষঃ শাস্ততং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

আহুত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদসুতা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ত্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে বাহুদেব ! তুমি পরম ব্রহ্ম পরম
ধাম, পরম পবিত্র, শাস্ত পুরুষ, দিব্য আদিত্য, জন্মবিহীন ও
সৰ্বব্যাপক, ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও বাসুদেব
ইহারা সকলেই তোমাকে উক্তরূপ কহিয়া থাকেন এবং তুমিও
আপনাকে ঐরূপ নির্দেশ করিলে । ১২-১৩ ।

সর্বমেতদুতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।

নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ আমি তদ্বিষয়ে
অনুমাত্র ও সন্দেহ করিনা ; হে ভগবন্ ! দেব ও দানবগণ
কেহই তোমাকে সম্যক্ অবগত নহে । ১৪ ।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতেশ ! হে জগৎপতে ! হে দেবদেব !
হে ভূতভাবন ! তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ । ১৫ ।

বক্তুমর্হন্তুশেষেণ দ্বিবা হাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাতির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া
রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দ্বিবা বিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্তন
কর । ১৬ ।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেনু চিন্ত্যাহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

যে যোগিন্ ! আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া
অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা
তোমাকে চিন্তা করিব । ১৭ ।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিৰ্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার ঐশ্বর্য ও বিভূতি
কীর্তন কর ; তোমার অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই
আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না । ১৮ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাছাত্মবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যাস্তো বিস্তরশ্চ মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিভূতির
ইয়ত্তা নাই, অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি সকল কীর্তন
করিতেছি শ্রবণ কর । ১৯ ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাস্বয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি,
আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত । ২০ ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্মরুতামগ্নি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জল সূর্য্য, মরুদগণের মধ্যে মরীচি, ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র । ২১ ।

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য । ২২ ।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর ও যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু । ২৩ ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও । আমি সেনানীগণের মধ্যে কাঙ্ক্ষিকের ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর । ২৪ ।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরীমশ্চ্যোকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞোহস্মি শ্বাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে ঔকার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ, শ্বাবরগণের মধ্যে হিমালয় । ২৫ ।

অশ্বথঃ সৰ্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধৰ্ববাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

আমি বৃক্ষ সমূহের মধ্যে অশ্বথ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ,
গন্ধৰ্বগণের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধ সমুদয়ের মধ্যে মহামুনি
কপিল । ২৬ ।

উচৈঃ শ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আমি অশ্বগণ মধ্যে অমৃতমহনোদ্ভূত উচৈঃশ্রবা, মাতঙ্গ মধ্যে
ঐরাবত, মহুবা মধ্যে রাজা । ২৭ ।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামগ্নি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

আমি আয়ুধ মধ্যে বজ্র ও ধেনুগণ মধ্যে কামধেনু, আমি
পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প, সর্পসম্পর্গণ মধ্যে বাসুকি । ২৮ ।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামর্ঘ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

নিবিষ ভূরজগণের মধ্যে অনন্ত, জলচর সকলের মধ্যে বরুণ,
পিতৃগণের মধ্যে অর্ঘ্যমা ও নিয়মিগণের মধ্যে যম । ২৯ ।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মুগাণাঞ্চ মুগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

আমি দৈতাগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষী মধ্যে গরুড় । ৩০ ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

বধাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১ ॥

আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর ও শ্রোতস্বতীর মধ্যে জাহুবী । ৩১ ।

সর্গাণামানিরন্তৃশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্তবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি সৃষ্ট পদার্থ সকলের আদি অন্ত ও মধ্য, বিদ্যা সকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা ; আমি বাদিগণের বাদ । ৩২ ।

অক্ষরাণামকারোহস্মি হৃন্দঃ সামাসিকশ্চ চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতোহহং বিশ্বাতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, ও সমাস মধ্যে হৃন্দ, আমি অনন্তকালও সর্বাতোমুখ বিধাতা । ৩৩ ।

মৃত্যুঃ সর্ববিরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীগাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

আমি সর্ব সংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা ধৃতি ও ক্ষমা । ৩৪ ।

বৃহৎ সাম তথা সাম্ভাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতানাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত । ৩৫ ।

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

আমি প্রতারকদিগের দ্যুত, তেজস্বীদিগের তেজ ; আমি জয়, অধ্যবসায়, সত্ত্ববান্দিগের সত্ত্ব । ৩৬ ।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা । ৩৭ ।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্যবিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান । ৩৮ ।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি সকল ভূতের বীজ, এই চরাচর ভূত আমি হইতে স্বতন্ত্র নয় । ৩৯ ।

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রৌক্তো বিভূতেৰ্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে পরস্তপ ! আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই, আমি
নান্দ্রোশে এই বিভূতি-বিস্তার কীর্তন করিলাম । ৪০ ।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ॥

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

বস্তৃতঃ যে যে বস্ত্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব-বল-সম্পন্ন, সেই
দনন্ত আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে । ৪১ ।

অথবা বলনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথকরূপে
জানিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি একাংশ দ্বারা এই
বিশ্বদংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি । ৪২ ।

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যদ্ব্যয়োক্তং নচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্তন করিলে তদ্বারা আমার (আমি হস্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ) মোহ দূর হইল ১ ।

ভবাপ্যয়ো হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

তত্ত্বং কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হে কমলপত্রাক্ষ ! আমি তোনার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোনার অক্ষয় মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম । ২ ।

এবমেতদ্ব্যথাৎ স্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥*

হে পরমেশ্বর ! তুমি আপনার ঐশ্বর্যরূপের বিষয় যেক্রূপ কীর্তন করিলে আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি । ৩ ।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো ! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার

সমাক্ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর !
সেই অবায় রূপ প্রদর্শন কর । ৪ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে পার্থ ! তুমি আমার নানাবর্ণ ও
নানাপ্রকার আকার বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ
কর । ৫ ।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা ।
বহুতদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

হে ভারত ! অগ্নি আমার কলেবরে আদিত্য বসু রুদ্র ও
মরুৎগণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয়, এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য অগ্নি বহুতর
বস্তু সকল দেখ । ৬ ।

ইহৈকস্থং জগৎ কুৎসং পশ্যাচ্চ সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রুমীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ ! আমার দেহে সচরাচর বিশ্ব এবং অগ্নি যে
কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে তাহাও নিরীক্ষণ
কর । ৭ ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রুমীমুনেনৈব সচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

কিন্তু তুমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ

হইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি,
তুমি ভদ্রারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর । ৮ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সজ্জ্বল করিলেন । হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ
বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বর্যরূপ প্রদর্শন করিলেন । ৯ ।

অনেকবস্ত্রনয়নমনেকাভূতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোজ্জ্বলায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

(তাহা) বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত
দিবায়ুধধারী । ১০ ।

দিব্যমাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

দিব্যানালা ও অশ্বরে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধ-চর্চিত, সর্বাশ্চর্য্য-
ময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট । ১১ ।

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্ত্রীস্তাসস্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদ্ভিত হয় তাহা
হইলে তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে । ১২ ।

তত্রৈকসং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকথা ।

অপশ্যদেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহুপ্রকারে বিভক্ত একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন । ১৩।

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অর্জুন সাতিশর বিস্তৃত ও পুলকিত হইয়া কৃতাজ্জলি-
পুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন । ১৪ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্ববাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংশ্চ সর্ববানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুন কহিলেন । হে দেব ! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণুজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করি-
তেছি । ১৫ ।

অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রং

পশ্যামি ত্বাং সর্ববতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

*পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! আমি তোমার বহুতর বাহু,
উদর, বক্তৃ ও নেত্র সম্পন্ন অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম ; কিন্তু
ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না । ১৬ ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
 তেজোরাশিঃ সর্ববতো দীপ্তিমস্তম্ ।
 পশ্যামি স্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্
 দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হতাশন-
 সূর্য্য-সঙ্কাশ তজ্জতুলা নিতাস্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ
 করিতেছি ১৭ ।

ব্রহ্মক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
 ব্রহ্মশ্চ বিশ্বশ্চ পরং নিধানম্ ।
 ব্রহ্মব্যয়ঃ শাস্ততধর্ম্মগোপ্তা
 সনাতনস্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়,
 শাস্তত ধর্ম্মপ্রতিপালক ও সনাতন (ইহা) জানি ১৮ ।

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীৰ্য্য-
 মনস্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।
 পশ্যামি স্বাং দীপ্তজ্বলাশবক্ত্রং
 স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯ ॥

তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-রহিত, তুমি অনন্তবীৰ্য্য ও অনন্ত-
 বাহু, হতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে ;
 চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে
 সম্বপ্ত করিতেছ ১৯ ।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমস্তুরং হি
 ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।
 দৃষ্টদ্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০ ।

হে মহাত্মন ! তুমি একাকী হইলেও স্বৰ্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ
 এবং দিক্‌পুঞ্জ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমার এই অভূত ও
 উগ্রমূর্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে । ২০ ।

অমী হি ত্বাং সুরসজ্জা বিশন্তি
 কেচিন্দ্রীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গৃণন্তি ।
 স্বস্তীভ্যুক্তা মহর্ষি সিদ্ধসজ্জাঃ
 স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১ ।

এই সকল সুরগণ শঙ্কিত মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন ;
 কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে
 প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার
 স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন । ২১ ।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
 বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চোঽঙ্গপাশ্চ ।
 গন্ধর্ব্ববক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জাঃ
 বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সৰ্বেষ ॥ ২২ ॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুত, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অসুর,

বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিম্বিত হইয়া
তোমাকে দর্শন করিতেছেন । ২২ ।

রূপং মহন্তে বহুবন্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্ ॥ ২৩ ।

হে মহাবাহো ! আমি এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে
তোমার বহু নয়ন ও অনেকমুখসম্পন্ন, বহুবাহু, বহু উরু ও বহু-
চরণসংযুক্ত, অনেক-উদর-পরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল আকার
নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি । ২৩ ।

নভঃ স্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাতাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি হ্রাং প্রব্যথিতান্তরাহ্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণে ॥ ২৪ ॥

হে বিষ্ণো ! আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহুবর্ণসম্পন্ন
বিবৃতানন, বিশাললোচন, ও অতি প্রদীপ্ত মূর্তি সন্দর্শন করিয়া
কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না,
আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে । ২৪ ।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দুর্মুখৈব কালানলসম্মিতানি ।

দিশো ন জানে ন লভে চ শশ্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

হে দেবেশ ! - তোমার কালাগ্নি-সন্নিভ, দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল
অবলোকন করিয়া আমার দিক্‌ভ্রম জন্মিয়াছে ; আমি কিছুতেই
সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; হে জগন্নিবাস ! তুমি প্রসন্ন
হও । ২৫ ।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ
সর্বৈ স হৈবাবনিপালসজ্জৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীযৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিৎখিলগ্না দশনাস্কিত্রেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাজৈঃ ॥ ২৭ ॥

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, অত্যাশ্রয় মহীপালগণ
আমাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বরে তোমার ভয়ঙ্কর
আস্ত্রবিবরে প্রবেশ করিতেছেন ; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাজ
চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে সংলগ্ন
হইয়াছে । ২৬ । ২৭ ।

যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীরা

বিশস্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

যেমন নদী প্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । ২৮ ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

যেমন ইচ্ছাপূর্বক বেগশালী পতঙ্গ সকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সকল লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । ২৯ ।

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ । হে বিষ্ণো ! তোমার প্রথর তেজ বিম্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে । ৩০ ।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রহরূপো

নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাদ্যং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিम् ॥ ৩১ ॥

এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি; হে দেববর! তুমি প্রসন্ন হও। আদি পুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; কেননা কি জন্ত তোমার এরূপ চেষ্টা আমি তাহা জানি না। ৩১।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি হ্যং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বৈ

যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন। ৩২।

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শক্রান্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় করত যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূৰ্ব্বেই

ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি ; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের
নিমিত্ত মাত্র হও । ৩৩ ।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট
করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর ; ব্যথিত হইও
না, অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে
পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে । ৩৪ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্ত
কৃতাজ্জলির্বৈপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া অর্জুন কম্পিত-
কলেবরে ও কৃতাজ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভীত মনে
গদগদ বচনে কহিলেন । ৩৫ ।

অর্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্য
জগৎ প্রহৃষ্যত্যানুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈব মমশ্রুস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন কহিলেন । হে হৃষীকেশ ! তোমার নাম কীর্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত রুষ্ট ও একান্ত অমুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে তাহা যুক্তিযুক্ত । ৩৬ ।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ত্বমক্ষরং সদসন্তত্পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

হে মহাত্মন ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও তাঁহার আদি কর্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূল কারণ অবিনাশী ব্রহ্ম, এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে । ৩৭ ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

ত্বমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

হে অনন্তরূপ ! তুমি আদিদেব, প্রাচীন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান । তুমি বিশ্বের জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম । তুমি এই বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান আছ । ৩৮ ।

বায়ুর্বমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিশ্চং প্রপিতামহশ্চ ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্ত্বঃ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

তুমি বায়ু, বম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ,
 আমি তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি । ৩৯ ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
 সর্বং সমাপ্নোসি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

হে সর্বেশ্বর ! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি
 তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি ; আমি তোমার চতুর্দিকেই
 নমস্কার করি ; তুমি অনন্তবীৰ্য্য অমিতপরাক্রমসম্পন্ন, তুমি
 সমুদয় বিধে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্বস্বরূপ
 বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে । ৪০ ।

সখেতি মত্তা প্রসভং যদুক্তং
 হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
 অজানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
 ষষ্ঠাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
 বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্বক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বহুজন সমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন উপবেশন ও ভোজন বিষয়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি । এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর । ৪১ । ৪২ ।

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত

ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রেয়ঃপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব ! তুমি স্থাবরজঙ্গমান্যক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু ; ত্রিলোকমধ্যে তোনা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই । ৪৩ ।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাযং

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়্যম্ ।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহঁসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

হে দেব ! অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি ; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের,

স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জনা করিবে তাহার সন্দেহ নাই । ৪৪ ।

অদৃষ্টপূর্বং হুষিতোহস্মি দৃষ্ট্ৱ ।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

হে দেব ! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পুনর্বার পূর্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর । ৪৫ ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

কিরীটমলকৃত, গদাচক্রাঙ্কিত সেই পূর্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি; হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্ত্তি ! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর । ৪৬ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্মেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদ্যং

যশ্মে হৃদন্তে ন হি দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন মনে যোগ-
মায়ার প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বস্বরূপ পরমরূপ
প্রদর্শন করিয়াছি তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে
নিরীক্ষণ করেন নাই । ৪৭ ।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্যোহহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং হৃদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

হে কুরুপ্রবীর ! তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই
বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্তা
দ্বারা আমার স্ফুটরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন না । ৪৮ ।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃদ্ধমেদম্ ।

রূপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না,
এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রীত মনে পুনরায় আমার পূর্বরূপ
প্রত্যক্ষ কর । ৪৯ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূয়া পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । বাসুদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনঃ স্বীয়
মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বরূপদর্শনভীত
অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন । ৫০ ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জুন কহিলেন । হে জনার্দন ! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত
মানুষমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম । ৫১ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্তু রূপস্তু নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । তুমি আমার যে নিতান্ত হৃনিরীক্ষা
মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্র গোচর করিবার নিমিত্ত
নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন । ৫২ ।

নাহং বেদৈর্ন তপস্যা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না । ৫৩ ।

তন্ময়া ত্বনন্যা শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তদ্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় । ৫৪ ।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ সং মামেতি পাশ্চব ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫৫ ।

ইতি বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পযু্যপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দ্ভমাঃ ॥ ১ ।

অৰ্জুন কহিলেন । (হে কৃষ্ণ !) যে সকল ভক্ত তদন্তচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারো শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ? ১ ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

ময্যাবেশা মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন । (হে অৰ্জুন !) যাহারা আমার প্রতি নিত্য অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আমাবে উপাসনা করিয়া থাকে তাহারাই প্রধান যোগী । ২ ।

যে ব্রহ্মরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পযু্যপাসতে !

সর্বব্রহ্মগমচিস্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সংনিয়মোদ্ভ্রিয়গ্রামং সর্বব্রহ্ম সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যাহারা সর্বব্রহ্ম সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিস্তনীয় সর্বব্যাপী, স্থাপরূপিবিশীন, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় । ৩।৪ ।

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিহুঃখং দেহবস্তুরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ৫ ।

যে তু সর্ববাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রস্তা মৎপরাঃ ।

অনশ্চেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্বর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যাহারা মৎপরাগণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্বক একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে এই মূহুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি । ৬, ৭ ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নির্বসিষ্ঠ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

তুমি আমাতে হিরতরূপে চিত্ত আহিত (স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । ৮ ।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয় ! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার তাহা হইলে আমার অনুশ্রবণরূপ অভ্যাসবোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর । ৯ ।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহপি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০ ॥

যদি তদ্বিক্ষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ মঙ্গল কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে । ১০ ।

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদেবাগমাশ্রিতঃ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু ষতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

যদি ইহাতেও অশক্ত হও তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সকল কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ কর । ১১ ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ভ্যাসানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

বিবেকশূণ্ণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কৰ্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কৰ্ম্মফলপরিত্যাগ করিলেই শান্তি লাভ হয় । ১২ ।

অদ্বৈত্যা সৰ্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখস্থঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

যে ভক্তিপ্রাণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমতঃস্বস্থ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৩।১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

हर्षामर्षभयोर्द्वैगैर्मूलैः यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

লোক সকল বাঁহা হইতে উদ্ভিন্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে
উদ্ভিন্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, (বিবাদ), ভয়
ও উদ্বেগ শত্ৰু তিনিই আমার প্রিয়। : ৫।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্বক্তাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি নিষ্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত, ও আবি (মনঃ-
পৌড়া) শূণ্য এবং সর্ব রত্নপরিভাগী—যিনি সকল কৰ্ম সকল
পরিভাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৬।

যো ন হ্রযতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য পাপ, পরিত্যাগ
করিয়া ভক্তিমান হন তিনিই আমার প্রিয়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতিশ্রোণী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ন্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ও যিনি মোনী, যিনি যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থির-মতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৮। ১৯।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পয়ূাপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্তপ্রকার ধর্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার অতীব প্রিয়। ২০।

ইতি ভক্তিয়োগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে কেশব ! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র
ক্ষেত্রজ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি । ১ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন । হে অৰ্জুন ! এই ভোগায়তন শরীরকে
ক্ষেত্র বলিয়া থাকে, যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন । তিনি
ক্ষেত্রজ । ২ ।

ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং যতজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে
বৈলক্ষণ্য জ্ঞান তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান । ৩ ।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃকু চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্যবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার-
যুক্ত, যেক্রমে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেক্রমে স্থাবর
জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেক্রমে এবং যে প্রকার
প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪ ।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ বহুবিধ বেদ,
তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। ৫ ।

মহাভূতান্‌হঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দেবঃ সূখং দুঃখং সজ্বাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়,
পাঁচ ইন্দ্রিয়—বিষয়, ইচ্ছা, দেব, সূখ, দুঃখ, শরীরজ্ঞানাত্মিকা
মনোরতি ও ধৈর্য্য এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্ম্য। উক্ত ধর্ম্যবিশিষ্ট
ইন্দ্রিয়াদিবিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। ৬।৭।

অমানিহ্মদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্তৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিসু ।

নিত্যং চ সমচিত্তদ্রমিষ্ঠানিষ্ঠোপপত্তিসু ॥ ১০ ॥

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরবাভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশেসেবিত্তমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১২ ॥

আত্মপ্রাণাঘরাহিতা, অদান্তিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, অ'চা'র্যোপাসনা (গুরুসেবা) শৌচ, ঐশ্বর্য, আত্মসংবল, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, এবং জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিতাগ এবং পুত্রকলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অবাভিচারিণী ভক্তি, নির্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পদার্থের স্বরূপ-দর্শন, ইহাই জ্ঞান ; ইহারই বিপরীতই অজ্ঞান । ৮ । ১২ ।

জ্ঞেয়ং যত্নং শ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমুতমশ্নুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বনাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্তন করি, শ্রবণ কর ; উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । অনাদি ও নির্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎ ও নন, অসৎ ও নন । ১৩ ।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

সর্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত
আছে ; তিনি সকলকে অবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন । ১৪ ।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোকৃৎ ॥ ১৫ ॥

তিনিই দ্বিবিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস, প্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ার গুণ সকল প্রকাশ করেন ; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল
বস্তুর আধার, তিনি নিগুণ কিন্তু সর্বগুণপালক । ১৫ ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরণং চরণম্বেব চ ।

সূক্ষ্মহাস্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থান
করিতেছেন । তিনি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয় ; তিনি জ্ঞানিদিগের
অতি স্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞানদিগের দূরবর্তী ১৬ ।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃৎ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের হ্রায় অবস্থান
করিতেছেন । তিনি ভূতগণের পোষক ; তিনি প্রলয়কালে
সমুদয় গ্রাস করেন ও সৃষ্টি কালে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন
হইয়া থাকেন । ১৭ ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববশ্ত বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ ও অন্ধকারের অতীত ;
তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য । তিনি সকলের হৃদয়ে
অবস্থান করিতেছেন । ১৮ ।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাস্ততঃ ।

মদ্ভুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপত্ততে ॥ ১৯ ॥

আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি
সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম, আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া
আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয় । ১৯ ।

প্রকৃতিঃ পুরুষং চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিকার
এবং সূখ দুঃখাদি গুণ সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । ২০ ।

কার্য্যাকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সূখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্ব্যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতি এবং সূখ দুঃখ
ভোগ দ্বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে ; পুরুষ দেহে
অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সূখ দুঃখ ভোগ করেন । ইন্দ্রিয়গণের
সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ ব্যোনিতে জন্মগ্রহণের এক-
মাত্র কারণ । ২১ । ২২ ।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

তিনি এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন ; কারণ তিনি সাক্ষি স্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্তা, প্রতিপালক মহেশ্বর ও অন্তর্ধামী । ২৩ ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়াহভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন । ২৪ ।

ধ্যানেনাত্মনি পশুন্তি কেচিদাত্মননাগ্ননা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

কেহ কেহ ধ্যান ও মনন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে ; কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ বা কৰ্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় । ২৫ ।

অন্যে হ্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্নোভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্তোব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্তের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে । ২৬ ।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রস্ত্রসংযোগান্তদিকি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

হে ভরতর্ষভ ! ক্ষেত্র ক্ষেত্রস্ত্রের সংযোগে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে । ২৭ ।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তুং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তুং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না, তিনি সকল ভূতে নির্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন তিনিই যথার্থ দেখিতেছেন । ২৮ ।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

লোক সকল সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিচ্ছিন্ন দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না, এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । ২৯ ।

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।

যঃ দ্রাশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতি সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম সমুদয় সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কৰ্ম্ম করেন না ; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যক্‌দর্শী । ৩০ ।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমমুপশ্যতি ।

ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা ॥ ৩১ ॥

যখন লোকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত সকলের
ভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩১ ।

অনাদিহ্মান্নিগুণহাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

হে কৌন্তেয় ! এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও
অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব প্রযুক্ত কোন কৰ্ম্মাকুষ্ঠান করেন না এবং
কোন প্রকার কৰ্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হন না । ৩২ ।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ
দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও
দৈহিক গুণ দোষ দ্বারা কখনই লিপ্ত হন না । ৩৩ ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

হে ভারত ! যেমন সূর্য্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে
সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত
করিয়া থাকেন । ৩৪ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুষ্যন্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর এবং
ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হন, তাহারা পরমপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৩৫ ।

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্নবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজ্ঞান মুনয়ঃ সর্বৈব পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন । ১ ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মাণাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

ইহা আশ্রয় করিলে আমার স্বরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না । ২ ।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সন্তবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

হে ভারত ! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধান হান ; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয় । ৩ ।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সন্তবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

হে কৌন্তেয় ! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমান্বক

মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি সমুদায়ের যোনি (মাতৃ-স্থানীয়) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা । ৪ ।

সদ্বৎ রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবপ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

হে মহাবাহো ! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজ, ও তম এই তিনটা গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে । ৫ ।

তত্র সদ্বৎ নির্মলহাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বপ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

হে নিষ্পাপ ! তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মলহ প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্কর ও নিকপদ্রব ; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞান-সম্পন্ন করে । ৬ ।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবপ্নাতি কোন্তেয় কস্ম্যসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত, উহা দেহীকে কস্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে । ৭ ।

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালশ্চনিদ্রাভিস্তন্নিবপ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক ; উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলশ ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে । ৮ ।

সত্বং সূখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯ ॥

হে ভারত ! সত্বগুণ প্রাণিগণকে সূখে মগ্ন, রজোগুণ কৰ্ম্মে সংস্কৃত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে । ৯ ।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

হে ভারত ! সত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ধৃত হয় । ১০ ।

সর্ববিদ্যারম্ভে দোহহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

যখন সত্বগুণ পরিবৰ্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে । ১১ ।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

হে ভরতর্ষভ ! রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কৰ্ম্মা-রম্ভ-স্পৃহা ও অশান্তি সজাত হইয়া থাকে । ১২ ।

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ ।

তমশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ পরিবৰ্দ্ধিত হইলে বিবেক ভ্রংশ অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সজাত হয় । ১৩ ।

যদা সত্ত্বৈ প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোক্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপত্ততে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গহ্বা কৰ্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয়, রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে, আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয় । ১৪ । ১৫ ।

কৰ্ম্মণঃ স্কৃততত্ত্বাত্ত্বঃ সাত্ত্বিকং নিশ্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সাত্ত্বিক কৰ্ম্মের ফল সূনিশ্মল সাত্ত্বিক স্কৃত, রাজস কৰ্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান । ১৬ ।

সদ্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসৌ লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানেনেব চ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুৎপত্ত হইয়া থাকে । ১৭ ।

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্যগুণবৃন্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

সাত্ত্বিকলোক উর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান

করেন এবং জঘন্তগুণসজ্জাত প্রমাদমোহাদির বশীভূত তামসিক লোকেরা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে । ১৮ ।

নাশ্চাং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

মানব বিবেকী হইয়া গুণ সকলকে সমস্ত কার্যের কৰ্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৯ ।

গুণানেন্তানতীত্য ব্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈৰ্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

দেহী দেহসমুৎপন্ন এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরাজনিত দুঃখপরম্পরা হইতে পরিব্রাজ্য লাভ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । ২০ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কলিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেন্তানতীতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবৰ্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে বাহুবদেব ! মনুষ্য কোন সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচার সম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন ? ২১ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

ত্ৰীভগবান্ কহিলেন । হে অৰ্জুন ! যিনি প্ৰকাশ, প্ৰবৃত্তি ও মোহ স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইলে ঘেৰ করেন না এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও অভিলাষ করেন না (তিনিই গুণাতীত পুৰুষ) । ২২ ।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈৰ্যো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বৰ্ত্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈঙ্গতে ॥২৩॥

যিনি উদাসীনের তায় আসীন হইয়া সুখদুঃখাদি গুণকাৰ্য্য দ্বারা বিচলিত হন না, প্ৰত্যুত গুণ সকল স্বকাৰ্য্যেই বাপ্ত আছে, তৎসমুদায়ের সহিত আমার কোন সংসৰ্ব নাই—এইৰূপ বিবেচনা করিয়া বৈৰ্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, (তিনিই গুণাতীত পুৰুষ) ২৩ ।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোচ্যশ্মকাক্ষণঃ ।

তুল্যপ্ৰিয়াপ্ৰিয়ো ধীৰস্তল্যানিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

যিনি সমদুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোভি, প্ৰস্তর ও কাক্ষণ সমদৃষ্টিতে দৰ্শন করেন, যাঁহার প্ৰিয় ও অপ্ৰিয় উভয়ই একৰূপ, যিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্ৰশংসা তুল্যৰূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন (তিনিই গুণাতীত পুৰুষ) । ২৪ ।

মানাপমানয়োস্তল্যাস্তল্যো মিত্ৰাৰিপক্ষয়োঃ ।

সৰ্ব্ববীৰস্তপৰিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যিনি মান ও অপমান এবং শত্ৰু ও মিত্ৰ তুল্যৰূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং যিনি সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুৰুষ । ২৫ ।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পভে ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হন । ২৬ ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্ত্রাব্যয়স্ত চ ।

শাস্ততস্ত চ ধর্ম্যস্ত সুখসৌকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

আমি, নিত্য ও অক্ষয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ; আমি শাস্তত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ; এবং আমিই ঐকান্তিক সুখের একমাত্র আশ্রয় ।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।



পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদরিং ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বখ বৃক্ষ আছে, উহার মূল উর্দ্ধে, উহার শাখা অধোতে, বেদ সমুদয় উহার পত্র ; যিনি এই অশ্বখ বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা । ১ ।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্শ্রনুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

ঐ বৃক্ষের শাখা অধ ও উর্দ্ধ দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উহা মন্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-কর্ম্ম-প্রসূতি মূল সকল অধঃ প্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে । ২ ।

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে
নাস্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখমেনং সুবিকৃতমূল-

মঙ্গলশস্ত্রেণ দৃঢ়েন হিদ্ধা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
 যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
 তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপঞ্চে
 যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার আদি নাই অন্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহাও অবগত হওয়া যায় না । এই বদ্ধমূল অশ্বখ বৃক্ষ সুদৃঢ় নিৰ্ম্মমত্বরূপ শত্রু দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মূলভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে, উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না । ৩ । ৪ ।

নিৰ্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
 অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
 দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
 র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

যাহা হইতে এই চিরন্তন সৎসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে ; আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই এই বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে । যাহারা অভিমান, মোহ, ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিকাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৫ ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাক্ষো ন পাবকঃ ।
 যদগহ্না ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না ;

চক্ষু স্বর্ঘ্য ও হতাশন যাহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না,
তাহাই আমার পরম পদ । ৬ ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃবৰ্ত্তানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ । ইনি প্রকৃতি-
বিশীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন । ৭ ।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

যেমন, বায়ু কুজুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্বক গমন করিয়া
থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে
তখন পূর্ব দেহ হইতে ইন্দ্রিয় সমুদয় গ্রহণ পূর্বক গমন করিয়া
থাকে । ৮ ।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনিং চ রসনং স্রাগমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসনা স্রাগ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত
হইয়া শব্দাদি বিষয় সমুদয় উপভোগ করে । ৯ ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

বিমূঢ় ব্যক্তির দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত বা বিষয়োপভোগ-
লিপ্ত ইন্দ্রিয় যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না,
জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন মহাত্ম্যারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন । ১০ ।

যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।

যতস্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

যোগী ব্যক্তিরূপে যত্নবান্ হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দর্শন করেন, কিন্তু অবিগুহ্যচিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরূপে যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না । ১১ ।

যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী । ১২ ।

গামাৰিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূহা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি সমুদয়ের পুষ্টিসাধন করিতেছি । ১৩ ।

অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

আমি ঔষ্ঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি । ১৪ ।

সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেত্তো

বেদান্তকৃদেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি, আমি হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা । ১৫ ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটা পুরুষলোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর । ১৬ ।

উত্তমঃ পুরুষত্ত্বাঃ পরমাত্মেত্বাদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

ইহা তিন অণু একটা উত্তম পুরুষ আছেন, তাহার নান পরমাত্মা; সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন । ১৭ ।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকি । ১৮ ।

যো মামেবমসংব্রূটো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিস্তুজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

হে ভারত ! যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সৰ্ব্ববত্তা সৰ্ব্বপ্রকারে আমাকে আরাধনা করে । ১৯ ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

হে অনঘ ভারত ! আমি এই পরম গুহ্যশাস্ত্র কীৰ্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয় । ২০ ।

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।



ষোড়শ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্বসংশুক্লিষ্টনিয়োগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবৌমতিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্ৰোধ, ত্যাগ, শান্তি, পর-নিন্দা-বর্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী (কুর্কশ্য করিতে লোকলজ্জা) অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা । হে অর্জুন ! বাহারা দৈব সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উক্ত ষড়্বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১-৩ ।

দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

হে পার্থ ! বাহারা আসুর সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয় । ৪ ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

দৈব সম্পদ মৌক্ষের ও আসুর সম্পদ বন্ধের হেতু ; হে পাণ্ডব ! তুমি দৈব সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না । ৫ ।

দেৱী ভূতসর্গেী লোকেহস্মিন্দৈব আসুর এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

হে পার্থ ! ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে ; দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিত রূপে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুরদিগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ৬ ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্বতে ॥ ৭ ॥

আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অব্যবস্থা হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয় ; (একারণ) তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, ও সত্য নাই । ৭ ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্রষ্টাপ্রকৃষনসমুত ও কামজনিত কহে । ৮ ।

এতাং দৃষ্টিমবর্ষভ্য নষ্টাভ্যানোহল্পবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করত
মলিন-চিত্ত, 'উগ্রকৰ্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের
নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয় । ৯ ।

কামাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদাম্বিতাঃ ।

মোহাদ্গৃহীত্বাহসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

দম্ভ, অতিমান, মদ, অশুচি ব্রত ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন
এবং মোহ বশতঃ অসং প্রতিগ্রহ (এই মন্ত্ৰের দ্বারা এই
দেবতাকে আরাধনা করিয়া প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব এবম্বৃত
হুগ্রগ্রহ) করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনার প্রবৃত্ত হয় । ১০ ।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরাযণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্ত্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

অমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কামোপ-
ভোগেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে । শত শত আশা-
পাশে বদ্ধ ও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্তায়
পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে । ১১-১২ ।

ইদমিচ্ছ ময়া লক্ষ্মিনং প্রাপ্ত্বো মনোরথম্ ।

ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিন্যো চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিন্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহন্ত্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যস্যৈ দাস্যামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আজি আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমার এই ধন আছে, পুনরায় এই অর্থ হইবে । আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অতঃ শত্রুকেও বিনাশ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিন্ধু, আমি বলবান, আমি সুখী । আমি ধনবান, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহ-জালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয় । ১৩-১৬ ।

আত্মসন্ত্রাবিতাঃ স্তুত্বা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞেস্তে দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন মান মদে প্রমত্ত হইয়া দত্ত সহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামযাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে । ১৭ ।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অহুয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার ঘেঁষ করে । ১৮ ।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান ।

ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাতুরীষেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ, ক্রুরস্বভাব, অশুভকারী নরা-
ধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি । ১৯ ।

আতুরীং যোনিমাপন্য মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব্য কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয় ! তাহারা আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে
লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২০ ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার, অতএব
এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে । ২১ ।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদারৈপ্রিভিনরঃ ।

আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয় ! যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে
মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কলাণ আচরণ করেন এবং
তৎপরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন । ২২ ।

যঃ শাস্ত্রবিধিযুৎসজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাप्নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে (কার্য্যে)

প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, পরমগতিও
প্রাপ্ত হয় না । ২৩ ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞান্য শাস্ত্রবিধানৌক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি ॥ ২৪ ॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ ;
তুমি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর । ২৪ ।

ইতি দৈবাস্তুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সঙ্ঘমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী ? সঙ্ঘ ? কি রজঃ ? অথবা তমঃ ? ১ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অৰ্জুন ! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার; সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তাহা শ্রবণ কর । ২ ।

সব্ধানুরূপা সর্বদাশ্রা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সং ॥ ৩ ॥

হে ভারত ! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষ ও শ্রদ্ধাময়, তন্মধ্যে পূৰ্ণে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেই-রূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন । ৩ ।

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রৈতান্ ভূতগণাংশ্চাত্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্বিক লোক দেবগণের, রাজস্বকেরা যক্ষ ও রাক্ষসগণের,
এবং তামসকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের বাগ করিয়া থাকে । ৪ ।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দম্ভাহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্নিক্রাস্তুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

যে সকল হীনচেতা ব্যক্তি দম্ভ, অহংকার, কাম, রাগ ও বল-
সম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত
ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে;
তাহাদিগকে অতি ক্রুরস্বভাব বলিয়া জানিবে । ৫-৬ ।

আহারস্তপি সর্বদা ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ
এবং দানও তিন প্রকার; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর । ৭ ।

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যস্থখপ্রীতিবিস্কন্ধাঃ ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, স্থখ ও ক্রটি-বর্ধন, রস
ও স্নেহযুক্ত, দার্বকালহারা মনোহর আহার সাত্বিকদিগের
প্রীতিকর । ৮ ।

কটুপ্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনাঃ ।

আহারা রাজসস্যেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ,
অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এবং ছঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার
রাজসগণের অভিলষিত । ৯ ।

যাতযামং গতরসং পুতিপয়ুসিতং চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

বহুক্ষণের গরু, গতরস, দুর্গন্ধ, পয়ুসিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট
অপবিত্র ভোজ্য তামসিকগিদগের প্রীতিকর । ১০ ।

অকলাকাজ্জিভিৰ্যজ্ঞো বিধিদিমৌ য ইজ্যতে ।

যচ্চবামেবেতি মনঃ সমাধায় স সাদ্বিকঃ ॥ ১১ ॥

ফলাকাজ্জাশূন্য ব্যক্তির। একাগ্রমনে কেবল কর্তব্য জ্ঞানে যে
অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাদ্বিক । ১১ ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

ফললাভ বা মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়,
তাহাই রাজসিক । ১২ ।

বিধিহীনমশ্ফটান্নং মদ্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

(শাস্ত্রোক্ত) বিধি, অন্নদান, মদ্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধা শূন্য যজ্ঞ
তামসিক বলিয়া কীর্তিত হয় । ১৩ ।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাপ্তপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যামহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্যা ও অহিংসা শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয় । ১৪ ।

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাস্পয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাস্পয় তপ । ১৫ ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

চিত্তশুদ্ধি, অক্লেশতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ । ১৬ ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক । ১৭ ।

সংকারমানপূজার্থং তপো দস্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

সংকার, মান, পূজালাভ ও দস্ত প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক । ১৮ ।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরসোৎসাদনার্থং বা তন্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

যে তপস্যা ছরাগ্রহ ও আশ্বপীড়া দ্বারা অথবা অস্ত্রের
উৎসাদনার্থ (বিনাশার্থ) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক । ১৯।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

কেবল দাতব্যজ্ঞানে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে
দান তাহাই সাত্ত্বিক । ২০।

যত্নু প্রতু্যপকারার্থং ফলমুদ্दिश्य বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্রিয়ং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

প্রতু্যপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্রেশ সহকারে যে দান
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক । ২১।

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহিতম্ ॥ ২২ ॥

অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সংকারবর্জিত, তিরস্কার-
সহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক । ২২।

ওঁ তৎসদिति নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মেণ নাম তিন প্রকার, ওঁ, তৎ ও সং, পূর্বে এই ত্রিবিধ
নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল । ২৩।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥

এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ
ঔকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ২৪ ।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মুমুক্শু ব্যক্তির। ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল “তত্”
এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়া অনুষ্ঠান
করিয়া থাকেন । ২৫ ।

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬ ॥

হে পার্থ ! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্ম্মে সংশব্দ প্রযুক্ত
হইয়া থাকে । ২৬ ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সংশব্দ
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ২৭ ।

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

হে পার্থ ! অশ্রদ্ধা সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অত্যাভ্যাস
কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কেননা তৎসমুদয় কি ইহলোকে বা
কি পরলোকে কুতরাপি সফল হয় না । ২৮ ।

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাং সম্পদশোভনম্ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তদ্বিমিচ্ছামি বেদিতুम् ।

ত্যাগস্ত চ হ্রবীকেশ পৃথক্‌কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে হ্রবীকেশ ! হে মহাবাহো ! হে কেশিনিসূদন ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীৰ্ত্তন কর । ১ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবরো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাপ্তস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অৰ্জুন ! পণ্ডিতেরা কাম্যকৰ্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কৰ্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন । ২ ।

তাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাপ্তস্মিনীযিগঃ ।

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

কেহ কেহ (সাংখ্য মনীষীরা) কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের জ্ঞান পরিত্যাগ করা বিধেয় । অত্বেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্বী এই কয়েকটী কার্য্য কোন রূপেই পরিত্যাপ করা কৰ্ত্তব্য নহে । ৩ ।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাক্ত ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান ! এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ
কিরূপ তাহা শ্রবণ কর ; তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিন প্রকার ৪।

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যামেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞ, দান ও তপস্বী কদাচ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে ; ইহার
অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়কর । এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের
চিত্তশুদ্ধির কারণ । ৫।

এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

হে পার্থ ! আমার নিশ্চয় মত এই যে, আসক্তি ও কৰ্ম্মফল
পরিত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ । ৬।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপত্ততে ।

মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

নিত্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু মোহবশতঃ
যে নিত্যকৰ্ম্ম ত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হয় । ৭।

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কারক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।

স কৃহা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

নিত্যান্ত দুঃখজনক বলিয়া কারক্লেণ ও ভয় প্রযুক্ত যে কৰ্ম্ম

পরিত্যাগ করা, তাহা রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।
রাজসত্যাগী পুরুষ ত্যাগলাভে সমর্থ হয় না । ৮ ।

কার্যামিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

হে অর্জুন ! আসক্তি ও কর্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য
বোধে যে কার্য্যামুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া
থাকে । ৯ ।

ন দ্বেষ্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুবজ্জতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি হুঃখাবহ
বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না । ১০ ।

নহি দেহভূতা শক্যাং ত্যক্ত্বুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ ।

যন্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ;
কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে । ১১ ।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিমাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্চিৎ ॥১২॥

কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া
থাকে ; যাঁহারা ত্যাগী নন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ
সমস্ত ফল লাভ করেন ; কিন্তু সন্ন্যাসীরা উহা লাভ করিতে
কদাচ সমর্থ হন না । ১২ ।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

হে মহাবাহো ! সর্বকৰ্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত সিদ্ধান্তের
অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে তাহা আমার নিকট
শ্রবণ কর । : ৩ ।

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্ধৰ্ম্ম ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা ও
দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নির্দিষ্ট আছে । : ৪ ।

শরীরবান্নোভির্যৎ কৰ্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।

গ্রাযাং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

গ্রাযা বা অগ্রাযাই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে
কার্য্য অনুষ্ঠান করে, সেই পাঁচটাই তাহার কারণ । ১৫ ।

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ কারণ অবধারণিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ
নিরূপাধি আত্মার কর্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে সেই দুৰ্ম্মতি কখন
মাধুর্দনী নয় । : ১ ।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।

হত্বাপি স ইমাল্লৌকিক ইত্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

যিনি আপনাকে কৰ্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাহার বুদ্ধি

কার্যো আসক্ত হয় না, তিনি লোক সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও
বিনাশ করেন না ও তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে
হয় না । ৭ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্যচোদনা ।

করণং কৰ্ম্য কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্যসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা কৰ্ম্যে প্রবৃত্তি সম্পাদনের हेतু ।
আর কারণ, কৰ্ম্য ও কৰ্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় । ১৮ ।

জ্ঞানং কৰ্ম্য চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচাতে গুণসজ্জানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সাজ্জাশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম্য ও কৰ্ত্তা সত্ত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ
কথিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ১৯ ।

সৰ্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষাতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাদ্বিকম্ ॥ ২০ ॥

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্ন
রূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাদ্বিক
জ্ঞান ২০ ।

পৃথীক্তেদু তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ধিধান্ ।

বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্ৰূপে জ্ঞাত হওয়া যায়,
তাহা রাজসিক । ২১ ।

যত্ত্ব কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যো সন্তমহৈতুকম্ ।

অতদ্ব্যর্থবদন্তঃ চ তন্তামসমুদাহতম্ ॥ ২২ ॥

কিস্তু যাহা একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান
আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক অবৌদ্ধিক তুচ্ছ জ্ঞান, তাহা তামসিক
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । ২২ ।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম যত্ত্ব সাঙ্গিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

কর্তৃত্বাভিমান-বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ
পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্যকৰ্ম্মই সাঙ্গিক । ২৩ ।

যত্ত্ব কামেপ্সুনা কৰ্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহতম্ ॥ ২৪ ॥

সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াস-
কর কৰ্ম্মই রাজসিক । ২৪ ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।

মোহাদারভ্যতে কৰ্ম্ম যৎ তন্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্যালোচনা না
করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক । ২৫ ।

মুক্তসঙ্কোহনহংবাদী ধৃত্বাৎসাহসমম্বিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোৰ্ণির্বিবিকারঃ কর্তা সাঙ্গিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও
অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারবিরহিত কর্তাই সাঙ্গিক । ২৬ ।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্তুলুকৌ হিংসাত্তাকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অহুরাগপরায়ণ, কর্মফলপ্রার্থী, লুকুপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও
হর্ষশোকসমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক । ২৭ ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিবাদৌ দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানী, অলস, বিবাদ-
যুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক । ২৮ ।

বুদ্ধের্ভেদং ধূতেশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

হে ধনঞ্জয় ! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে, আমি উহা সম্যক্রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করি-
তেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর । ২৯ ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি দ্বারা (ধর্ম্মে) প্রবৃত্তি (অধর্ম্মে) নিবৃত্তি,
কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়
তাহা সাত্ত্বিকী । ৩০ ।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য ও অকার্য প্রকৃত-
রূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী । ৩১ ।

অধর্ম্যঃ ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসম্ভূতা ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া অধর্মকে ধর্ম
ও সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী । ৩২ ।

ধৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

হে পার্থ ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অত্ন বিষয়
ধারণ না করিয়া, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য সমুদয় ধারণ করে,
তাহা সাত্ত্বিকী । ৩৩ ।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্বা ধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

হে পার্থ ! হে অর্জুন ! যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফল লাভের অভি-
সন্ধি করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা
রাজসী । ৩৪ ।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্শ্লেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে পার্থ ! অবিবেচক পুরুষ বাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক,
বিষাদ ও গর্ভ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসিক
ধৈর্য্য । ৩৫ ।

সুখং হি দানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর । ৩৬ ।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাদ্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবদান হইয়া থাকে ও যাহা অগ্রে বিষের তায় ও পরিণামে অমৃতের তায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্বারা আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রদত্ততা জন্মে, তাহা সাদ্বিক বলিয়া অভিহিত হয় । ৩৭ ।

বিষয়েন্দ্రిয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য । পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ । ৩৮ ।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোৎপন্নং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা তামসিক সুখ । ৩৯ ।

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাজ্জিভিগু'ণৈঃ ॥৪০॥

পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী
কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না । ৪০ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরস্তপ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগু'ণৈঃ ॥ ৪১ ॥

হে পরস্তপ ! ' এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে । ৪১ ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য
এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম । ৪২ ।

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দান্য্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাধুত্বতা, দান ও ঈশ্বর-
ভাব এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম । ৪৩ ।

কৃষিগোরক্ষাবাগিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাভ্যকং কর্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

কৃষি, গো-রক্ষণ ও বাগিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক
কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম । ৪৪ ।

স্বৈ স্বৈ কৰ্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

মনুষ্য স্ব স্ব কৰ্মনিরত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এক্ষণে স্বকৰ্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেক্ষণে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর । ৪৫ ।

য তঃ প্রযুক্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

যাহা হইতে সকলের প্রযুক্তি প্রাপ্তিভূত হইতেছে, যিনি এই বিধ সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকৰ্ম দ্বারা তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । ৪৬ ।

শ্রেরান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাং স্বনুষ্ঠিতাং ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুর্দ্ভিন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধৰ্ম্মও শ্রেষ্ঠ, কেননা, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ছঃখভোগ কবিত্তে হয় না । ৪৭ ।

সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্বদারত্না হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

হে কৌন্তেয় ! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কৰ্ম্মই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না । ৪৮ ।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকস্ম্যাসিক্তিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

আসক্তিবিবর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সৰ্বকস্ম-নিবৃত্তিকপ সত্ত্বশুদ্ধি কস্মনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৪৯ ।

সিক্তিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০ ॥

হে কোন্তেয়! সিক্ত পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীশ্রিয়মাংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ বাদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিরিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং ।

বিমূঢ়্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবে। বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্বক লঘু আহার ও নির্জনে বাস করিবে। এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে,

এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন । ৫১। ৫২। ৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুর্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না, সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে । ৫৪ ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্বব্যাপিত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন । ৫৫ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম সমুদয় অনুষ্ঠান করত আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাস্বত পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫৬ ।

চেতসা সর্বকর্মানি ময়ি সংশ্রুত্ব মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিন্তা সমর্পণ কর । ৫৭ ।

মচ্চিত্তঃ সৰ্ববিদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিশ্যসি ।

অথ চেষ্টমহাকারাম শ্রোয্যসি বিনঙ্ক্যসি ॥ ৫৮ ॥

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার অঙ্গুগ্রহে ছুস্তর দ্বঃখ সকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫৮ ।

যথহঙ্কারমাপ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।

মিথৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োক্যতি ॥ ৫৯ ॥

যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত যুদ্ধ করিব না এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, কারণ প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। ৫৯ ।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্নেন কৰ্ম্মণা ।

কর্ত্ত্বুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্বাবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয় ! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়স্বভাব শূরতার বশীভূত হইয়া, তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৬০ ।

ঈশ্বরঃ সৰ্ববিভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্ববিভূতানি যজ্ঞারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

হে অর্জুন ! যেমন সূত্রধার দারুণস্ত্রে আকৃষ্ট কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১ ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্ন্যসি শান্ততম ॥৬২॥

হে ভারত ! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শাস্তি ও শান্ত্যত্মক স্থান প্রাপ্ত হইবে । ৬২ ।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।

বিমৃষ্টৌ তদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর । ৬৩ ।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইকৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

তুমি আমার একান্ত প্রিয়তর এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর । ৬৪ ।

মন্যনা ভব মন্তন্তেগ নদ্ব্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈশ্ব্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়ৌহসি মে ॥৬৫॥

তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকেই অবশ্য প্রাপ্ত হইবে । ৬৫ ।

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

তুমি সমস্ত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না । ৬৬ ।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাস্তু শ্রদ্ধবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি । ৬৭ ॥

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধৰ্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অস্বরাপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না । ৬৭ ।

য ইদং পরমঃ গুহ্যং মন্ত্ৰক্লেষভিধাস্ততি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃতা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ং ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন । ৬৮ ।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্তঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম (আর কেহই) হইবে না । ৬৯ ।

অধ্যেষাতে চ য ইমং ধর্ম্যাং সংবাদমানয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্ম্মাভিগত সংবাদ অধ্যয়ন করিলে,
তাহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চনা করা হইবে । ৭০ ।

শ্রদ্ধাবাননসূশ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভীলোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

যে মনুষ্য অসুশ্রাবণ নী হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই
সংবাদ শ্রবণ করিলে, সে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের
শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে । ৭১ ।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ দ্বয়েকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণক্টেস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত ? হে
ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত ? । ৭২ ।

নক্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা দ্বংপ্রাসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অর্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! তোমার অল্পগ্রহে মোহান্ধকার
নিরাকৃত হওয়াতে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সকল
সন্দেহই দূর হইয়াছে এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে আমি অবশ্যই
তাহার অনুষ্ঠান করিব । ৭৩ ।

ইত্যহং বাসুদেবসা পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্বুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥



সজ্জয় কহিনেন, (মহারাজ !) আমি বাসুদেব ও অর্জুনের
এইরূপ অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম । ৭০ ।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্যাসের অনুগ্রহে আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরম
গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি । ৭৫ ।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহূর্শ্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন্ ! কৃষ্ণার্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ
করিয়া বারংবার হৃষ্ট ও মন্তুষ্ট হইতেছি । ৭৬ ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমতাদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

হে রাজন্ ! আমি শ্রীহরির সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ
পূর্বক বারংবার বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি । ৭৭ ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ ।

তত্র শ্রীর্কির্বিজয়ো ভূতিক্ষ্রবা নীতিশ্চিতিশ্চম ॥ ৭৮ ॥

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও
অর্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, অভ্যুদয়
ও নীতি লাভ হইবে । ৭৮ ।

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

গীতামাহাত্ম্যম্ ।

ঋষিকৃবাচ—

গীতায়ান্বেচৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্ঠ্যং যদ্বি সপ্ততমং পরম্ ।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুদমন্ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তিসুতঃ ফলম্ ।
ব্যাসো বা বাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যাহথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥
অগ্রে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদদাম্যত্র ব্যাসস্ত্র্যাস্ত্রান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
সৰ্বেষাপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ॥
পার্থো বৎসঃ সুধীৰ্ভোক্তা দুষ্কঃ গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥
সারথ্যমৰ্জ্জুনস্যাদৌ কুৰ্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাভ্রনে নমঃ ॥ ৬ ॥
সংসারসাগরং ঘোরং তৰ্ভুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতা-নাবং সমাসাচ্ছ পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ ।
মোক্ষমিচ্ছতি মুঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥

মে শৃণুন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশং ।
 ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায বৈ ।
 ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নিগুণম্ ॥ ১০ ॥
 সোপানান্টাদৈশাং বদ্য ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।
 ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেম-ভক্ত্যা দিকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥
 সাধোগীতান্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।
 শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কার্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥
 গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
 স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
 নস্মাদগীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।
 ধিক্ তস্ম মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥
 গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
 ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদৃগ্হাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥
 গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।
 ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিশ্ফলং জগুঃ ।
 ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ত্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥
 গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ ।
 গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তর্দিক্যাস্থরসম্মতম্ ।
 তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮ ॥
 তস্মাক্ষর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা ।

সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
 যোহধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
 স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শক্রভিন্ স হীয়তে ॥ ২০ ॥
 শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নদ্যাং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥
 দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।
 যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥
 গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
 যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাস্থ চ ।
 যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥
 গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।
 ক্রতবো বাজিমেধাত্মাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কৌতুহল্যেব যঃ পরম্ ।
 শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥
 গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহপর্য্যতেব সাদরাৎ ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্মৈ ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
 যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 দয়িতামাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥
 তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ ।

ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০ ॥
 বিস্ফোটিকাদয়ো দেহে ন বাধস্তে কদাচন ।
 লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিক্ষাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥
 জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্ত চ ॥ ৩২ ॥
 স মুক্তঃ স সুখী লোকে কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যতে ।
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমন্তসা ॥ ৩৩ ॥
 অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
 সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রহিগৃহ চ সর্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ ॥
 রত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।
 গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥
 যস্যাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াম্ রমতে সদা ।
 স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥
 দর্শনীষঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
 স এব যান্ত্রিকো যাজ্ঞী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥
 গীতায়াম্ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে ।
 তত্র সর্ববাণি তীর্থানি শ্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥

ନିବସନ୍ତି ସଦା ଦେହେ ଦେହଶେଷେହିମି ସର୍ବଦା ।
 ସର୍ବେ ଦେବାଞ୍ଚ ଶ୍ଵୟୋ ଯୋଗିନୋ ଦେହସଂକ୍ରାନ୍ତାଃ ॥ ୪୧ ॥
 ଗୋପାଳୋ ବାଳକୃଷ୍ଣୋହିମି ନାରଦଂବପାର୍ଶ୍ଵଦୈଃ ।
 ସହାୟୋ ଜାୟତେ ଶିଞ୍ଜଂ ଷତ୍ର ଗୀତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ॥ ୪୨ ॥
 ଷତ୍ର ଗୀତାବିଚାରଞ୍ଚ ପାଠନଂ ପଠନଂ ତଥା ।
 ମୋଦତେ ତତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋ ଭଗବାନ୍ ରାଧୟା ସହଃ ॥ ୪୩ ॥

ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ନୁବାଚ ।—

ଗୀତା ମେ ହୃଦୟଂ ପାର୍ଥ ! ଗୀତା ମେ ସାରମୁତ୍ତମମ୍ ।
 ଗୀତା ମେ ଜ୍ଞାନମତ୍ୟୁଗ୍ରଂ ଗୀତା ମେ ଜ୍ଞାନମବ୍ୟୟମ୍ ॥ ୪୪ ॥
 ଗୀତା ମେ ଚୋତ୍ତମଂ ସ୍ଥାନଂ ଗୀତା ମେ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
 ଗୀତା ମେ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ଗୀତା ମେ ପରମୋଂଶୁରଃ ॥ ୪୫ ॥
 ଗୀତାଶ୍ରୟେହଂ ତିର୍ଥାମି ଗୀତା ମେ ପରମଂ ଗୃହମ୍ ।
 ଗୀତାଜ୍ଞାନଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକଂ ପାଳୟାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪୬ ॥
 ଗୀତା ମେ ପରମା ବିଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମରୂପା ନ ସଂଶୟଃ ।
 ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହରା ନିତ୍ୟମନିର୍ବିବାଚ୍ୟପଦାତ୍ମିକା ॥ ୪୭ ॥
 ଗୀତାନାମାନି ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଗୁହ୍ୟାନି ଶୃଣୁ ପାଣ୍ଡବ ।
 କୀର୍ତ୍ତନାଂ ସର୍ବପାପାନି ବିଲୟଂ ଯାନ୍ତି ତଂକ୍ଷଣାତ୍ ॥ ୪୮ ॥
 ଗଙ୍ଗାଂ ଗୀତା ଚ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ସତ୍ୟା ପତିବ୍ରତା ।
 ବ୍ରହ୍ମା ବଳିବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଠା ତ୍ରିସକ୍ୟା ମୁକ୍ତିଗେହିନୀ ॥ ୪୯ ॥
 ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଚିଦାନନ୍ଦା ଭବସ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରାନ୍ତିନାଶିନୀ ।
 ବେଦବ୍ରତୀ ପରାନନ୍ଦା ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥଜ୍ଞାନମଞ୍ଜରୀ ॥ ୫୦ ॥

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্কিং পাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয় ॥ ৫২ ॥
 ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥
 তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥
 অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥
 গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্কয়ম্ ।
 ত্রিছোকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতস্তথা ॥ ৫৭ ॥
 গীতার্গমেন পাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
 স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
 গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তুকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জননঃ ॥ ৫৯ ॥
 গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥
 গীতাধ্যায়সমাযুক্তোমুতোমানুষ্যতাং ব্রজেৎ ।

ଗୀତାଭ୍ୟାସଂ ପୁନଃ କୃତ୍ବା ଲଭତେ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତମାମ୍ ॥ ୬୧ ॥

ଗୀତେତ୍ବାଞ୍ଚାରସଂଯୁକ୍ତୋନ୍ନୟିତାମାଣୋ ଗତିଂ ଲଭେତ୍ ।

ଯଦ୍ୟତ୍ କର୍ମ ଚ ସର୍ବତ୍ର ଗୀତାପାଠପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ।

ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ଚ ନିର୍ଦୋଷଂ ଭୂତ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣହମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୬୨ ॥

ପିତୃନୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ଯଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଗୀତାପାଠଂ କରୋତି ହି ।

ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ ପିତରସ୍ତସ୍ୟ ନିରୟାଦ୍ୟାନ୍ତି ସ୍ବର୍ଗତିମ୍ ॥ ୬୩ ॥

ଗୀତାପାଠେନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ ପିତରଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧତର୍ପିତାଃ ।

ପିତୃଲୋକଂ ପ୍ରାପ୍ନୋଷ୍ୟେବ ପୁତ୍ରାଶୀର୍ବାଦତତ୍ପରାଃ ॥ ୬୪ ॥

ଗୀତାପୁସ୍ତକଦାନଃ ଧେନୁପୁଚ୍ଛସମସ୍ଥିତଂ ।

କୃତ୍ବା ଚ ତଦ୍ଦିନେ ସମାକ୍ କୃତାର୍ଥୋ ଜାୟତେ ଜନଃ ॥ ୬୫ ॥

ପୁସ୍ତକଂ ହେମସଂଯୁକ୍ତଂ ଗୀତାୟାଃ ପ୍ରକରୋତି ଯଃ ।

ଦଦ୍ବା ବିପ୍ରାୟ ବିଦ୍ରୁଷେ ଜାୟତେ ନ ପୁନର୍ଭବମ୍ ॥ ୬୬ ॥

ଶତପୁସ୍ତକଦାନଃ ଗୀତାୟାଃ ପ୍ରକରୋତି ଯଃ ।

ସ ଯାତି ବ୍ରହ୍ମସଦନଂ ପୁନରାବୃତ୍ତିହର୍ତ୍ତମ୍ ॥ ୬୭ ॥

ଗୀତାଦାନପ୍ରଭାବେନ ସପ୍ତକଲ୍ଲମିତାଃ ସମାଃ ।

ବିଷ୍ଣୁଲୋକମବାପ୍ୟାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁନା ସହ ମୋଦତେ ॥ ୬୮ ॥

ସମାକ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚ ଗୀତାର୍ଥଂ ପୁସ୍ତକଂ ଯଃ ପ୍ରଦାପୟେତ୍ ।

ତତ୍ସ୍ମେ ପ୍ରିତଃ ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ଦଦାତି ମାନସେସ୍ପିତମ୍ ॥ ୬୯ ॥

ଦେହଂମାନୁଷମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣୋଷୁ ଭାରତ ।

ନ ଶୃଣୋତି ନ ପଠତି ଗୀତାମୟୂତରୂପିଣୀମ୍ ।

ହସ୍ତାନ୍ତ୍ୟାକ୍ତାୟୂତଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ସ ନରୋ ବିଷୟଶ୍ଚୂତେ ॥ ୭୦ ॥

ଜନଃ ସଂସାରଦୁଃଖାର୍ତ୍ତୋ ଗୀତାଜ୍ଞାନଂ ସମାଲଭେତ୍ ।

পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

গীতামাত্রিত্য বহুবোভূভুজো জনকাদয়ঃ ।

নিধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥

গীতাসু ন বিশেষোহস্তি জনেষু চারকেষু চ ।

জ্ঞানেষেব সমগ্রেযু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥

যোহভিমানেন গর্ষণেণ গীতানিন্দাং করোতি চ ।

সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহুতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥

অহঙ্কারেণ মুঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে ।

কুন্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।

স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥

চৌর্যাং কৃহা চ গীতায়্যাঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।

ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

যঃ শ্রদ্ধা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।

নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা ভ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥

গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাস্বরং তথা ।

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যপস্করৈঃ ।

অনেকৈর্বব্ধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥

স্বত উবাচ ।—

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়্যাঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।

গীতাস্তে পঠতে যস্ত যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

(৯)

গীতায়াঃ পঠনং কৃদ্ভা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথাপাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
শ্রীহা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ববিশ্রুখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতামাহাত্ম্যং
সমাপ্তম্ ।

